ভারত মহিলা

ভারত মহিলা

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

নিবেদন

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রধানতম সাক্ষী হইতেছে নারীজাতির শিক্ষা, সভ্যতা, স্বদেশ-প্রীতি ও বদান্যতার ইতিহাস। 'সেই দেশ সভ্য যেথা রমণী পূজিতা' এই বাণী প্রাচীন ভারতে যথার্থরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ভারতের শান্ত-স্নিগ্ধ শ্যামল-তরুরাজি-বেষ্টিত নিভৃত বনভবনে যে নারী-গৌরব-বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও প্রাচীন ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

পুরুষ ও নারী বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গৌরব। পুরুষের শক্তি, বল, সাহস ও বীর্য এবং নারীর প্রীতি, স্নেহ, সেবা ও ধর্ম জগতের সব দেশের সভ্যজাতির উন্নতির মূলে তুল্যভাবে সহায়তা করিয়া থাকে। পুরুষ অতি প্রাচীনকালেও নারীকে তাহার সম আসন প্রদান করিয়াছিল। জগতের অন্যান্য দেশে যখন নারীজাতির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শিত হইত না, সেই অতি দূর শতাব্দীতেও ভারতের নারী পুরুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের নারী-মর্যাদার ইতিহাসের সাক্ষী বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ।

পুরাকালে যম নামক একজন প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।

পুরাকালে নারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদের অধ্যাপনা এবং সাবিত্রী-বচনে অধিকার ছিল। 'সাবিত্রী-বচন' অর্থ গায়ত্রী-মন্ত্র। উপনয়নের সময় মুঞ্জতৃণদ্বারা মেখলা বন্ধন করিবার প্রথা ছিল। মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নের একটি বিশেষ চিহ্ন।

প্রাচীন ভারতের নারী-সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই আমরা সেকালের ভাষা হইতে। কঠী, বহ্বৃচী প্রভৃতি শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণ যজুর্বেদের 'কঠ' নামক একটি শাখা আছে। ঐ শাখায় পারদর্শিনী মহিলারা 'কঠী' বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। ঋগ্বেদে পারদর্শিনী এবং হোতৃকার্যে দক্ষা মহিলারা বহ্বৃচী নামে অভিহিতা হইতেন। আচার্যা উপাধ্যায়া বা উপাধ্যায়ী প্রভৃতি উপাধি হইতেও জানা যায়, স্ত্রীলোক আচার্যা অর্থাৎ ব্যাখ্যাত্রী ছিলেন। কোন স্ত্রীলোক যদি উপাধ্যায় হইতেন তাঁহাকে উপাধ্যায়া নামে আখ্যাত করা হইত।

সেকালের অনেক মহিলাই শাস্ত্রদক্ষা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ঋষিদের সহিত প্রকাশ্য সভায় ব্রহ্ম-বিষয়ে মহিলারা বিচার করিতেন।

মৈত্রেয়ী ও গার্গীর নাম সর্বলোক-প্রসিদ্ধ। অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বড়বা, প্রাতীচেয়ী প্রভৃতি নারীগণকে আচার্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

এইভাবে নারীজাতির যে শিক্ষার ধারা ভারতের বুকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী কখনও বা হয়ত পরিপূর্ণা হইয়া প্রবাহিতা হইয়াছে, কখনও শীর্ণা হইয়াছে, আবার কখনও বর্ষাবারি-উচ্ছ্বসিত পূর্ণতোয়া স্রোতস্বিনীরূপে দিকে দিকে শতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নারীজাতির ইতিহাসে বৈচিত্র্য আছে। নারীজাতির ইতিহাস কেবল শিক্ষার ইতিহাস নহে। আমরা এক দিকে যেমন ঈশ্বরপরায়ণা ভক্তিমতী নারীর অদম্য আত্মনিবেদন দেখিতে পাই—তেমনি দেখিতে পাই দেশের জন্য—সমাজের জন্য—সতী-ধর্মের জন্য—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—নারী-শক্তি প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে ইতিহাস ইহা একদিনের ইতিহাস নহে। এই ইতিহাস নানা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নানা বিভিন্ন রূপে প্রকটিত।

আমি সেই অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত নারী প্রগতির কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমখণ্ড ভারত-মহিলা প্রকাশ করিলাম। এইরূপ চেষ্টা ইহার পূর্বে অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু বিস্তারিত ভাবে ঐতিহাসিক ক্রম-পদ্ধতি ক্রমে প্রকাশ করিবার উদ্যম বোধ হয় এই প্রথম।

অতীতের ইতিহাসের সহিত বর্তমানের একটা যোগ-সূত্র রক্ষা করিয়া চলিলে স্পষ্টভাবে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে—অতীতের নারীজাতির মধ্যে যে তেজ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, আহিতাগ্নিক ঋষিদের মত তাহাদের সেই তেজ-বহ্নি আজও সমান ভাবে প্রজ্বলিত। তাহা চিরন্তন—তাহা কোনদিন কোন কালে নির্বাপিত হইবে না।

নারীজাতির প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তি যুগে যুগে অত্যাচার করিয়াছে, উৎপীড়ন করিয়াছে, লাঞ্ছনা ও নিপীড়নে তাহার মর্মশক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়াছে,—কিন্তু কুমারী উমার সাধনার মত তপস্যার ভীষণ কঠোরতার মধ্য দিয়া নারীজাতি ধীরে ধীরে লাভ করিয়াছে নীলকণ্ঠের অপরিমেয় শক্তি ও সহিষ্ণুতা; তাই আজ নারী-শক্তি, নারী-আত্মা যুগ যুগ সঞ্চিত লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে—সে অন্যায়ের প্রতিবিধিৎসার জন্য বজ্রের ন্যায় সুকঠিন ও দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আপনার মহিমাকে পূর্ণরূপে সার্থক করিয়া তুলিবেই। নারীর এই যে জাগরণ তাহা নিবারণ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
৬ই কার্তিক, ১৩৫৬, কলিকাতা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমাদের নিবেদন

শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ভারত মহিলা' গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত। নব কলেবরে এই গ্রন্থের প্রকাশে আজ যিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হইতেন, সদাহাস্যমুখ শিশুর মত সরল সেই বিরল চরিত্রের মানুষটি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই ; অকস্মাৎ কয়েক মাস পূর্বে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানির নব কলেবরে প্রকাশ-দিনে আজ তাই বারবার বেদনাভারাক্রান্ত মনে তাঁহার কথাই মনে পড়িতেছে। মনস্বী যোগেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা এই মানুষটির মধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই।

বঙ্গ-সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বহু বিষয়েই আচার্য যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন পথিকৃৎ। বলা বাহুল্য, তাঁহার 'ভারত মহিলা' গ্রন্থখানিও বিষয়বৈচিত্র্যে নূতন দিগন্তের দিগ্‌দর্শী। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের বৈদিক, ঔপনিষদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগের মহীয়সী মহিলাগণের জীবন-কাহিনী সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকার জন্য সাবলীল ভাষায় অপর্ব আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই জাতীয় রচনায় যে দুইটি ত্রুটি সাধারণত প্রতীয়মান হয়, তাহা হইল—কাহিনীগুলি হয় অনাবশ্যক তথ্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, নয়ত কাহিনীকে আকর্ষণীয় করিতে গিয়া রচনাগুলি তথ্যবিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই দুই প্রকারের ত্রুটি হইতে এই জাতীয় কাহিনীকে মুক্ত রাখিতে পারা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বলা বাহুল্য, এই দুরূহ কাজটি যোগেন্দ্রনাথ সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। 'ভারত মহিলা'গণের জীবন-কাহিনীগুলি যেমন কোথায়ও অনাবশ্যক তথ্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই, তেমনি সেগুলি তথ্যবিচ্যুত হইয়া কোথায়ও কাল্পনিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয় নাই।

এপ্রিল ১৯৬৫ বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

পরমকল্যাণীয়া বধূমাতা শ্রীমতী প্রভা দেবী
চিরায়ুষ্মতীষু

সূচীপত্র

বৈদিক যুগ

ঔপনিষদিক যুগ

পৌরাণিক যুগ

বৌদ্ধ যুগ

বৈদিক যুগ

বিশ্ববারা

বৈদিক যুগে সমাজে নারীজাতির বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। প্রাচীনকালে বেদের ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল "নারী।" নারী শব্দে নেত্রী বুঝাইত। এই একটি শব্দ হইতেই আর্যসমাজে স্ত্রীজাতির যে কিরূপ সম্মান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে যুগে সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। কন্যা পিতৃগৃহে শিক্ষালাভ করিতেন এবং যৌবনে স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ পতি গ্রহণ করিতেন। আর্যনারীবা স্বামীর সহিত একসঙ্গে দেবপূজা এবং যজ্ঞ ইত্যাদি করিতেন। তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরমধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখিবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে সস্ত্রীক যজ্ঞ সম্পাদনের কথা আছে। যে সকল আর্য-নারী বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা "ঋষি" আখ্যা পাইয়াছিলেন। কোন কোন বৈদিক মহিলা গভীর তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াও যশস্বিনী হইয়াছিলেন। এখানে একে একে তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে যে সকল মহিলারা নারী-ঋষি নামে পরিচিতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী মহিলা বিশ্ববারা ছিলেন প্রধান। তাঁহার রচিত মন্ত্রগুলি যেমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ তেমনই বিশ্ববারার অসাধারণ মনীষার পরিচায়ক। বিশ্ববারা অত্রিমুনির গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য তিনি অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা ঋষি নামে পরিচিত।

এখানে গোত্র কথাটার অর্থ বলিতেছি। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে আর্যগণ কোন স্থানেই দীর্ঘকাল বাস কবিতে পারেন নাই, কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা স্থায়ীভাবে গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পঞ্চনদ প্রদেশেই তাঁহাদের প্রথম পারিবারিক জীবন গঠিত হইল। তাঁহারা এদেশে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও পরিজনবর্গ লইয়া বেশ সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পরিবার ও পরিজন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একই পূর্বপুরুষের সন্তানেরা বহু পরিবারের কর্তা হইল। তখন পরিবারের মধ্যে গোত্রের বন্ধন স্থাপিত হইল ও বহু পরিবার লইয়া এক একটি বিশিষ্ট গোত্র গড়িয়া উঠিল; তবে এমনও হইত যে একই গোত্রভুক্ত পরিবারসমূহ একই পূর্বপুরুষের

বংশধর হইতেন না। কিন্তু একটা সাধারণ ধারণার বশীভূত হইয়া তাঁহারা ঐরূপ একটি গোত্রের অঙ্গীভূত হইতেন। ইহাই হইতেছে গোত্রের ইতিহাস।

আর্যেরা প্রথমে প্রকৃতির উপাসক ছিলেন; প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া, কিংবা রুদ্রমূর্তিতে ভীত হইয়া, তাহারই বিবিধ প্রকাশকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা ঊষা, সূর্য, আকাশ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বহু দেবদেবীর স্তুতিগান করিতেন।

সেকালে স্ত্রীলোকের পতির সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে কোনও বাধা ছিল না, সেকথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তটি বিশ্ববারা রচনা করিয়াছিলেন। এই সূক্তে ছয়টি মাত্র ঋক্ আছে। আমরা প্রথম ঋক্ হইতে বুঝিতে পারিতেছি ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা দেবগণের স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকের কার্যও সম্পাদন করিতেছেন, এবং তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য-সম্বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

তাঁহার বিরচিত ঋক্‌গুলি শব্দমাধুর্যে ও ভাবসম্পদে এত সুন্দর যে পড়িলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। আমরা এইখানে সেই ঋক্‌গুলির ভাবার্থ প্রদান করিলাম।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত শিখা বিস্তার করিয়া দীপ্তিমান্ হইয়াছেন। ঊষা-কালে অগ্নি তাঁহার প্রশস্ত শিখা বিস্তার করিয়া অত্যন্ত শোভান্বিত হইয়াছেন। এই সময়ে বিশ্ববারা হোম করিবার জন্য ঘৃতপাত্র-সংযুক্তা হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তব করিতে করিতে অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছেন।

হে অগ্নি! তুমি সম্যকরূপে প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য বিস্তার কর। তুমি হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাক। তুমি যে যজমানের নিকট বর্তমান থাক, তিনি সমস্ত ধন লাভ করেন এবং তোমার মত যোগ্য অতিথির প্রাপ্য ঘৃতাদি উত্তম দ্রব্য প্রদান করেন।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমাদিগকে বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর। অর্থাৎ তোমার কৃপায় আমরা যেন ধনবান্ হই। তুমি আমাদের শত্রুগণের পরাক্রম নিবারণ কর; এবং আমাদের পতি ও পত্নীর পবিত্র দাম্পত্য প্রেমকে নিবিড়তর কর—সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর। তোমার আশীর্বাদে তাদের যেন কখন পরস্পর বিচ্ছেদ না ঘটে।

হে প্রজ্বলিত দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমি তোমার দীপ্তির স্তব করি। তুমি যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত থাক, তুমি আমাদের কামনা পূরণ কর।

হে অগ্নি! যজ্ঞে যজমানগণ তোমাকে প্রজ্বলিত ও আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞস্থলে দেবগণকে পূজা কর।

হে পূজকগণ! হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর এবং দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থ তাঁহাকে বরণ কর।

অপালা

অপালাও বিশ্ববারার ন্যায় অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্রির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী অপালার জীবন বড় দুঃখময় ছিল। কোন কারণে ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার স্বামী অপালাকে পরিত্যাগ করেন। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অপালা পিতার আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। সোম ইন্দ্রের প্রিয় বলিয়া তিনি ইন্দ্রকে সোম দান করিবার জন্য একদিন নদীতীরে গমন করেন। স্নান করিয়া ফিরিবার পথে সোমও পাইয়াছিলেন, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে সেই সোম তিনি নিজেই পান করেন। সোম পান করিবার সময় তাঁহার দন্তঘর্ষণজনিত শব্দ শুনিয়া ইন্দ্র তাহা অভিষব প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়া অপালার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে কি সোম অভিযুক্ত হইতেছে?" অপালা বলিলেন, "তাহা নহে, দন্তঘর্ষণজনিত শব্দ হইয়াছে।" ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনী অপালা বলিলেন, "আপনি ত সোমপান করিবার জন্য গৃহে গৃহে গমন করেন, তবে কেন আপনি ফিরিয়া যাইতেছেন? আপনি আমার দন্তমধ্য হইতে সোম পান করুন।" পরে ইন্দ্রই আসিয়াছেন ইহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়া সোমকে বলিলেনঃ "হে সোম! ইন্দ্র সোমপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুতবেগে গমন কর।"

ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষী হইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তিনি অপালার মুখ হইতেই সোমপান করিলেন। তখন অপালা বলিলেন—"আপনি সোমপানে কি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন?" ইন্দ্র বলিলেন—"আমি তোমার মুখ হইতে সোম পান করিয়া সত্যসত্যই আনন্দিত হইয়াছি এবং তৃপ্তি লাভ করিয়াছি,—আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বর প্রার্থনা কর।"

তখন অপালা বলিলেন—"হে ইন্দ্রদেব ! আমার পিতার মস্তকে কেশ নাই এবং তাঁহার ক্ষেত্র অনুর্বর, প্রথমে আমার পিতার এই দোষ দুইটি দূর করুন।" পরে কহিলেন—"আমি ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার সেই ত্বক্‌রোগ দূর করিয়া দিন।"

ইন্দ্রের বরে অপালার পিতার অনুর্বর শস্যক্ষেত্র উর্বর এবং শস্যসম্পদশালী হইল এবং কেশশূন্য মস্তক কেশে পরিপূর্ণ হইল। ইন্দ্রের কৃপায় অপালাও ত্বক-রোগ মুক্ত হইয়া সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইলেন। *

ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের আটটি ঋক্ অপালা রচনা করিয়াছিলেন।

জলের দিকে গমন করিবার সময় কন্যা [অপালা] সোমও লাভ করিলেন; গৃহে আনয়ন কালে [সোমকে] বলিলেন,—ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তোমাকে অভিষব করি।

হে ইন্দ্র ! তুমি বীর, তুমি দীপ্তিমান্, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এই দন্ত দ্বারা অভিযুত ভ্রষ্ট নব শক্তু, অপূপ এবং উক্‌থস্তুতিবিশিষ্ট সোম পান কর।

হে ইন্দ্র ! বহুবার আমাদিগকে সামর্থ্যযুক্ত কর। আমাদিগকে বহুসংখ্যক কর, আমাদিগকে বহুবার ধন দান কর।

হে ইন্দ্র ! আমাব পিতার যে উষব ক্ষেত্র আছে তাহা উৎপাদনশীল এবং তাঁহার মস্তক কেশপূর্ণ কর।

অপালার পিতৃভক্তি আদর্শস্থানীয় ছিল।

* ইন্দ্র অপালাকে তিনবার আপনার রথ, শকট এবং যুগের ছিদ্রের মধ্য দিয়া আকর্ষণ করিলেন; তাহাতে তাঁহার দোষযুক্ত ত্বক্ তিনবার উন্মুক্ত হইল। প্রথমবারের ত্বক্ হইতে শল্যকের উৎপত্তি হইল, দ্বিতীয়বার ত্বক্ হইতে গোধার উৎপত্তি হইল এবং তৃতীয়বারের ত্বক্ হইতে কৃকলাস হইল এবং ব্রহ্মবাদিনীর বর্ণ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইল।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। ৮ম মণ্ডল। ৯১ সূক্ত

শশ্বতী

প্রয়োগ নামক রাজার পুত্র অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া বিকলাঙ্গ হইয়াছিলেন। এই অসঙ্গ শশ্বতীর স্বামী ছিলেন। শশ্বতী মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা। বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। পতিপরায়ণা শশ্বতী কঠোব তপস্যার দ্বাবা স্বামীকে রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ৩৪ সংখ্যক মন্ত্রটি শশ্বতী কর্তৃক সঙ্কলিত। এই মন্ত্রটির দ্বারা তিনি তাঁহার স্বামীর স্তব করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রাণী

বেদের সময়ে পুরুষগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইতেছি। কক্ষীবান্ নামে এক ঋষি অধ্যয়ন-শেষে গৃহপ্রত্যাগমন-কালে পথিপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দৈবক্রমে স্বনয় নামে একজন রাজা সেই পথ দিয়া যাইবাব কালে নিদ্রিত কক্ষীবান্‌কে দেখিতে পান এবং তিনি তাঁহার রূপে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনাব গৃহে লইয়া যাইয়া স্বহস্তে আপনার দশকন্যাকে সমর্পণ করেন। এইরূপ অনেক কিছু দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে একাধিক পত্নী গ্রহণ প্রচলিত ছিল।

সপত্নী কামনা বৈদিকযুগের নারীদিগের নিকট একান্ত অমঙ্গলজনক বলিয় বিবেচিত হইত। বৈদিক মহিলারা নিয়ত প্রার্থনা করিতেন যাহাতে তাঁহাদেব সপত্নী না হয়। সেকালে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও সপত্নীর আবির্ভাব কোন নারীর নিকট প্রার্থনীয় ছিল না—এজন্য সেকালের মহিলারা সপত্নীর পীড়নের জন্য দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করিতেন। ইন্দ্রাণী নামক মহিলা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তে সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্ব লাভের জন্য এই মন্ত্রসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে এই মন্ত্রগুলি অনেকটা আধুনিক কালে বিরচিত। তবে এই সূক্ত রচনার সময়ে যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদিগের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এই যে তীব্রশক্তিযুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি খনন পূর্বক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, ইহা দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায় স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার তেজঃ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও, যাহাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকেন, তুমি তাহা করিয়া দাও।

হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে।

সেই সপত্নীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূব অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দি।

হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আরও ক্ষমতা আছে; এস আমবা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি।

হে পতি! এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান [বালিশ] তোমাকে মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়।

এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে।

ঘোষা

ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা। ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। পরে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার রোগ ভাল করিয়া দিলে, তিনি পতিলাভ করেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সংখ্যক সূক্ত ইঁহার দ্বারা সঙ্কলিত। ঘোষা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদের যে সর্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে, আমরা রাত্রিদিন সেই রথের নাম করিতেছি। যেমন পিতার নামে আনন্দ হয়, তদ্রূপ উহার নামে আনন্দ হয়।

আমাদিগকে মধুর বাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত করুন। আমাদের কর্ম সুসম্পন্ন করুন। যজ্ঞে সোমরস যেরূপ প্রীতিপ্রদ হয়, আমরা যেন জনগণের নিকট তেমন প্রীতিময়ী এবং আনন্দদায়িনী হই। আমাদিগকে প্রশংসনীয় ধনভাগ প্রদান করুন।

একটি কন্যা পিত্রালয়ে অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, আপনারাই তাহার সৌভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা অন্ধ, রুগ্ন, খঞ্জ, অথবা যে নীচ তাঁহার আশ্রয়স্বরূপ। যেমন পুরাতন রথকে কেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়া উহাকে নূতনের ন্যায় করিয়া তোলে, তেমনই আপনাদের কৃপায়ই জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষি পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুগ্রের পুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। যজ্ঞের সময় আপনাদের দু'জনের সেই সমুদয় কার্য বিশেষ রূপে বর্ণনা করিবার যোগ্য।

আপনাদের অপূর্ব বীরত্বসূচক সমুদয় কার্য আমি লোকসমাজে বর্ণনা করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত আপনারা দুজনে অতি নিপুণ চিকিৎসক, এই নিমিত্ত আপনাদের আশ্রয় পাইবার আশায় আপনাদিগকে স্তব করিতেছি। পিতা পুত্রকে যেরূপ শিক্ষা দেন, আপনারা আমাকে সেইরূপ শিক্ষা দান করুন। আমি নিঃসঙ্গ, আমি জ্ঞানহারা, অতএব প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এইরূপ বর দিন যেন আমার কোন দুর্গতি না ঘটে।

শুন্ধ্যুব নামে পুরুমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, আপনারা রথে করিয়া তাহাকে লইয়া বিমদের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বধ্রিমতী যখন প্রসববেদনায় কাতর হইয়া আপনাদের আহ্বান করিয়াছিল, তখন আপনারা সেই নারীর প্রসব-বেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব করাইয়াছিলেন।

জরাজীর্ণ কলি নামক স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়া যখন আপনাদের স্তব করিয়াছিল, তখন আপনারাই তাঁহাকে নবযৌবন দান করিয়াছিলেন। আপনারাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনারাই বিশ্পলা নামক ছিন্নপদা নারীকে লৌহময় চরণ দ্বারা সংযোজিত করিয়া তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তি-বিশিষ্টা করিয়াছিলেন। শত্রুগণ যখন রেভ নামক ব্যক্তিকে মৃতপ্রায় করিয়া গুহামধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আপনারাই তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অত্রিমুনি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনারাই অগ্নির তেজ হ্রাস করিয়া তাঁহার প্রাণ দান করিয়াছিলেন।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের দুই জনের নাম কীর্তনে আনন্দ হয়। আপনারা যে পথে গমন করেন সেই পথের চতুর্দিকে সকলের কণ্ঠে আপনাদের বন্দনারব ধ্বনিত হয়। আপনারা যদি পত্নীসহ কোন ব্যক্তিকে আপনাদের রথে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি বা কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না।

ঋভু নামক দেবতারা আপনাদের যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথ আকাশে উত্থিত হইলে আকাশ-দুহিতা উষাদেবীর আবির্ভাব হয় এবং সূর্যদেব হইতে অতিসুন্দর দিন ও রাত্রি, মন অপেক্ষাও অধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণ করিয়া আপনারা পর্বতাভিমুখে গমন করেন। শযু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধা ধেনুকে পুনরায় দুগ্ধবতী করিয়া দিন।

ভৃগুসন্তানগণ যেমন রথ প্রস্তুত করে, আমিও সেইরূপ আপনাদের জন্য এই মন্ত্র রচনা করিলাম। বিবাহের সময় পিতা যেমন কন্যাকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া সম্প্রদান করেন, তদ্রূপ আমি এই স্তবকে অলঙ্কৃত করিতেছি।

হে অন্নসম্পন্ন ধনসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হউন। আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হউক। আপনারা উভয়ে আমার কল্যাণ-বিধাতা, অতএব আমার রক্ষক হউন। আমি যেন পতিগৃহে গমন করিয়া পতির প্রিয়পাত্রী হইতে পারি। আমি আপনাদের স্তব করিয়া থাকি, অতএব আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান করুন। আমার পতিগৃহে যাইবার পথ ভয়বিহীন করুন। আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনাদের আশীর্বাদে আমার পুত্র-পৌত্র প্রপৌত্রাদি যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করে।

বৈদিক মহিলারাও পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইবার জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন এই সমুদয় মন্ত্র হইতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

সূর্যা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি সূর্যাঋষি কর্তৃক সঙ্কলিত। সূর্যার সঙ্কলিত মন্ত্রগুলি বরবধূর শুভ কল্যাণ কামনা ও আশীর্বাদে পূর্ণ।

সূর্যার বিবাহ-সময়ে রৈভী নামক ঋক্‌গুলি সূর্যার সহচরী হইয়াছিল। নরাশংসীনাম্নী ঋক্‌গুলি তাঁহার দাসী হইয়াছিল। তাঁহার মনোহর বসনখানি সামগান দ্বারা পবিত্র ও উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। এই মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে বিবাহের সময় পাত্রীর সমবয়স্কা কয়েকটি সঙ্গিনী তাহার চিত্তের সন্তোষ বিধানার্থ সহচরী হইয়া থাকে। পতিগৃহে যাইবার সময় পাত্রীর সঙ্গে একটি দাসী যায়, বিবাহসময় পাত্রী উজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, কিন্তু সূর্যার বিবাহের সময় এ সকলের কোন প্রয়োজন হয় নাই। কেননা সূর্যা ছিলেন সর্বগুণালঙ্কৃতা বিদুষী মহিলা। রৈভী নাম্নী ঋক্‌গুলি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। তিনি সুমধুর স্বরে রৈভী নামক মন্ত্রগুলি গান করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রগুলিই তাঁহার সহচরীর কার্য করিত, কাজেই নারী সহচরীব আব কোন প্রয়োজন হয় নাই। এই ভাবে নবাশংসী [নামক ঋক্‌গুলি] তাঁহার দাসী হইল। এক কথায় সূর্যাব পবিত্র ধর্মজীবনই তাঁহার বিবাহের উপঢৌকন স্বরূপ হইয়াছিল। সূর্যার স্নিগ্ধ শান্ত নয়নযুগল, পতিগৃহে প্রেরণীয় তৈল হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন দ্রব্য স্বরূপ হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। তাঁহার পবিত্র প্রশান্ত মনই তাঁহার পতিগৃহে গমনের শকটস্বরূপ হইয়াছিল। অনন্ত আকাশ হইয়াছিল ঊর্ধ্বাচ্ছাদন-স্বরূপ,—দুই শুক্র অর্থাৎ দুইটি শুকতারা তাঁহার শকটবাহী হইল। এইরূপে সূর্যা তাঁহার পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মবাদিনী সূর্যা পতিগৃহে গমন করিলেন। ত্রয়োবিংশতি মন্ত্রের অর্থ এই যে আমাদের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণে যে পথে গমন করেন, সেপথ যেন নিরাপদ হয়। হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! পতিপত্নীর মিলন যেন দৃঢ় হয় ও অক্ষয় হয়।

এই কন্যাকে পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামীকুলে গ্রথিত করিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই কন্যা যেন পতিগৃহে সৌভাগ্যবতী হয়। হে কন্যা! পূষা [দেবতা] তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাউন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপরে প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।

যাহারা শত্রুতাচরণ করিবার জন্য এই পতিপত্নীর নিকট আসিবে তাহারা বিনষ্ট হউক। এই দম্পতি যেন আপনাদের পুণ্যের দ্বারা সমুদয় বিপদকে কাটাইয়া উঠে। ইহাদের নিকট হইতে শত্রুগণ যেন দূরে পলায়ন করে।

এই নবপরিণীতা বধূ অতি সুলক্ষণা। তোমরা সকলে মিলিয়া আসিয়া এই বধূকে দেখ। এই বধূ সৌভাগ্যবতী হউন, স্বামীর প্রিয়পাত্রী হউন, এই আশীর্বাদ করিয়া তোমরা গৃহে গমন কর।

হে নবদম্পতি! তোমরা দুইজনে একস্থানে থাক, পরস্পর পৃথক হইও না। নানা সুখ-ভোগ-বিলাসে পুত্রপৌত্রাদির সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া তোমাদের জীবন যেন শান্তিতে অতিবাহিত হয়।

প্রজাপতির শুভ আশীর্বাদে তোমাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করুক। অর্য্যমা [দেবতা] তোমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। দাসদাসী, পশু প্রভৃতির প্রতি মঙ্গল বিধান কর।

হে বধূ! তুমি কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। দাসদাসী, পশু প্রভৃতির মঙ্গল বিধান কর।

হে বধূ! তোমার নেত্রদ্বয় যেন দোষশূন্য হয়। তুমি পতির কল্যাণকারিণী হও, পশুদিগের মঙ্গলদায়িনী হও। তোমার মন যেন সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। তোমার দেহ যেন লাবণ্যপূর্ণ উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র-প্রসবিনী হও এবং দেবতাদের প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে।

হে ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে যেন দশটি পুত্র জন্মে এবং ইহার পতিকে লইয়া যেন একাদশ ব্যক্তিমতী হয়।

হে বধূ! তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তোমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী তোমাদের উত্তমরূপে একত্র সম্মিলিত করিয়া রাখুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এই কন্যারূপ পুষ্পটি পিতৃকুলরূপ তরু হইতে উত্তোলিত করিয়া পতির হস্তে গ্রথিত হইল।

হে সৌভাগ্যবতি নারি! তুমি কখন মলিন বসন পরিধান করিবে না, কেননা

মলিন বসন পরিধান করা দারিদ্রের লক্ষণ। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান ধার্মিক-গণকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী ধন দান করো। হে হিতৈষী বন্ধুগণ, তোমরা সকলে দেখ, পত্নী, পতির সহিত অভিন্ন রূপা হইয়া পতিগৃহে চলিয়াছেন।

এই নবপরিণীতা বধূ অতি সুলক্ষণা, এই সৌভাগ্যবতী নারী, বিদুষী, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এস, 'আশীর্বাদ কর, যেন এই বধূ স্বামীর প্রিয়পাত্রী হন, এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর।

সেই সুদূর অতীতে কবে কোন্ শুভ মিলনবাসরে নবপরিণীত বরবধূ, দেবতার নিকট যে শুভ আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই পবিত্র বাণী যুগযুগান্তরের তিমিররাশি ভেদ করিয়া আজও আমাদের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সূক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে বর্তমান যুগের স্ত্রী-আচার ও আদর্শের সহিত সেকালের স্ত্রী-আচার ও আদর্শের যে অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সূক্তের অনেক অংশ পূর্বকালে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করা হইত এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

যমী

যম ও যমী যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী। যম ও যমী বিরচিত বা কথিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও একাদশ ঋক্‌গুলি এবং ১৫৪ সূক্তের পাঁচটি ঋক্ ইঁহারা প্রণয়ন করেন।

এই সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। অনেকের মত এই যে যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি। সে যাহাই হউক না কেন, এই সূক্তের ঋক্‌গুলি গভীর জ্ঞান-জ্ঞাপক।

যমী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণাম কি? পরলোক কি? মৃত্যুর পর মানবের কিরূপ ব্যবস্থা হয় ইহাতে সে সকলের উল্লেখ আছে। পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভ হয়, এই সূক্তে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। বেদের যম স্বর্গ-সুখদাতা, দণ্ডের নিয়ন্তা নহেন, তাহাও ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। ১৫৪ সূক্তের ঋক্‌গুলি এইরূপ :—

কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়, কেহ কেহ ঘৃত সেবন করে, যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।

যাঁহারা তপস্যাবলে দুর্ধর্ষ হইয়াছেন, যাঁহারা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।

যাঁহারা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যেসকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা সহস্র দক্ষিণা দান করেন, হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।

যে সকল পূর্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক পুণ্যবান্ হইয়াছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন, হে যম! এই প্রেত সেই পুণ্য ধামে তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুক।

যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র প্রকার সংকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্য প্রভাব সূর্যকে রক্ষা করেন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন, হে যম! এই প্রেত সেই সকল ঋষিদের নিকট গমন করুক।

সার্পরাজ্ঞী

সার্পরাজ্ঞী ঋষি দশম মণ্ডলের ১৮৯ সূক্তটি রচনা করিয়াছিলেন। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। এই সূক্তে তিনটি মন্ত্র আছে। মন্ত্র কয়টি এইরূপ :—

এই যে উজ্জ্বলবর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্বদিককে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন।

ইঁহার দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করিতেছে, সেই দীপ্তি ইঁহার প্রাণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি বৃহৎ হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিলেন।

এই সূর্যদেব কেমন প্রভান্বিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। এই গমনশীল সূর্যের উদ্দেশ্যে স্তব উচ্চারিত হইতেছে। প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণমালায় ভূষিত হইয়া থাকেন।

বাক্

বাক্ অম্ভৃন ঋষির কন্যা। এই বিদুষী মহিলা ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটি মন্ত্র পরমাত্মা দেবতার উদ্দেশে রচনা করেন। বাগ্‌দেবীকে এই সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাক্ যে এই সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তাহার কোনও নিদর্শন নাই। বক্তা আপনাকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এই মন্ত্রগুলি দেবীসূক্ত নামে পরিচিত। চণ্ডীপাঠের পূর্বে আমাদেব দেশে এই দেবীসূক্ত পঠিত হইয়া থাকে। অনেকের মতে "মার্কণ্ডেয় পুরাণের" চণ্ডীমাহাত্ম্যপ্রকরণ বাকেব প্রণীত এই আটটি মন্ত্র অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। এই জন্য বাগ্‌দেবীর নাম ভারতবর্ষের সর্বত্র আজও গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইতেছে।

যে অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বলিয়া শঙ্করাচার্যের নাম পৃথিবীর সর্বত্র বিঘোষিত, যে মতকে আশ্রয় করিয়া শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের কবল হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই মতের প্রধান গৌরব ও খ্যাতি বাগ্‌দেবীরই বহুল পরিমাণে প্রাপ্য বলিয়া বলা যাইতে পারে। কেননা অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রটি বাক্ ঋষিই প্রচার করিয়াছিলেন।

বাগ্‌দেবী বলিতেছেন :—

আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের আত্মাস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করি। আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি। আমিই মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বদ্বয়কে ধারণ করি।

আমি সমুদয় বিশ্বজগতের অধিশ্বরীরূপে বিরাজ করি। আমাকে দেবতারা নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া আছি।

যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, তিনি আমারই সহায়তাতে সেই সকল কার্য করেন। আমাকে যাহারা জানে না, তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। হে বিদ্বান্! শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।

দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ

দিয়া থাকি। যাহাকে ইচ্ছা, আমি বলবান্, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান করিতে পারি।

রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দি। আমিই জনগণের কল্যাণার্থ যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি।

আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি; সেই আকাশ এই জগতের মস্তক-স্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে।

গোধা

গোধা নাম্নী আর্য-মহিলা ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের অর্থ এই :—

হে দেবগণ, আমি তোমাদের বিষয়ে অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম, স্তুতিপাঠ ইত্যাদি কোন বিষয়েরই ত্রুটি করি নাই, কোন কর্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নাই। বৈদিক মন্ত্র শ্রুতি অনুসারে আমি আচরণ করিয়া থাকি। দুই হাতে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করি—অতএব আমার প্রতি সদয় হইবে, ইহাই আমার প্রার্থনীয়।

জুহু

জুহু বৃহস্পতির পত্নী। বৃহস্পতি পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন-পূর্বক সকল দেবতার সহিত একান্ত হইয়া তাঁহাদের অবয়বতুল্য হইয়াছিলেন। পরে তিনি পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নীকে পাইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় পত্নীকে

প্রাপ্ত হইলেন। বৃহস্পতির স্ত্রীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করাই এই সূক্তের বিষয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তের সাতটি মন্ত্র জুহু কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানধারণা করিলে যে তাহা সার্থক হইয়া উঠে না, এই মন্ত্র কয়টি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এজন্যই এই সূক্তে জুহু বলিতেছেন :—

দেবতারা আবার তাঁহাকে ধর্মপত্নী আনিয়া দিলেন, মনুষ্যরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা শপথপূর্বক [অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাই এই শপথ করিয়া] শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্বার সমর্পণ করিলেন।

শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনরায় আনিয়া দিয়া দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া সর্বসুখে অবস্থিতি করিতেছেন।

শ্রদ্ধা ও শচী

শ্রদ্ধা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী মহিলা ঋগ্বেদের পাঁচটি মন্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহাতে যজ্ঞ, দান ইত্যাদি করিলে মানুষের কিরূপ পুণ্য লাভ হয় তাহা বর্ণিত আছে।

শচী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তটি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে। এই সূক্তে শচীই দেবতা এবং শচীই ঋষি। সপত্নী হওয়া যে নারী মাত্রেরই বাঞ্ছনীয় নহে এবং কাহারও যেন সপত্নী না হয় তাহা বুঝাইবার জন্যই ঐ মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি এইরূপ :—

এই যে সূর্য উদয় হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্য উদয় হইয়াছে, আমি ইহা বুঝিয়াছি, সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি।

আমিই স্বামীর নিকট প্রিয়তমা হইব। আমাকেই আবার স্বামী সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আমার কার্যের অনুমোদন করেন।

শেষ মন্ত্রটিতে আছে :—

আমি সকল সপত্নীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের [স্বামীর] উপর প্রভুত্ব করি, পবিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি।

এই সূক্তের মন্ত্র কয়টি সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র। এটা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহা বলাই বাহুল্য। শচীকে এই সূক্তের দেবতা ও ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্তটি যে ইন্দ্রাণীর উক্তি সূক্তের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

বৈদিক যুগে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। শান্তিপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমের শান্তি বক্ষার জন্য সপত্নীর আবির্ভাব সে কালের আর্যমহিলারা অত্যন্ত অকল্যাণজনক মনে করিতেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেব ১৪৫ সূক্তটি, ইন্দ্রাণী নাম্নী আর্যমহিলা সঙ্কলন করেন। এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে। সপত্নী জগতে অত্যন্ত পীড়াদায়িকা বলিয়া যেন কোন নারীব সপত্নী না হয় এই সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি এই মন্ত্রগুলি সঙ্কলন কবিয়াছিলেন।

লোপামুদ্রা

অগস্ত্য বৈদিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বীর্যবত্তা পুবাণেও পবিকীর্তিত আছে। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যখন ভয়ানক যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, সে সময়ে নিরুপায় দেবতারা অগস্ত্য ঋষিব শবণাপন্ন হইলে তিনি সমুদ্র পান করিয়া দেবতাদিগকে অসুরবধে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইল্বল ও বাতাপি নামক দুইজন দুষ্ট দৈত্যকে বধ করাও তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

বিন্ধ্যপর্বত যখন মস্তকোত্তোলন পূর্বক সূর্যদেবের গতিপথ রোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় দেবতাদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্যাচলের গর্ব খর্ব কবিয়াছিলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি তীর্থ করিতে দক্ষিণদেশে গমন করিব। আমার পক্ষে তোমাকে ডিঙাইয়া যাওয়া অসম্ভব; অতএব তুমি একটু মাথা নীচু কর, আমি তীর্থ করিয়া আসি।"

অগস্ত্যের কথায় বিন্ধ্যপর্বত মাথা নীচু করিলেন। তখন মুনি বিন্ধ্যপর্বত উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিয়া বলিলেন—"যতক্ষণ আমি তীর্থ করিয়া ফিরিয়া না আসিব, ততক্ষণ এমনই ভাবে নত অবস্থায় অবস্থান করিও। যদি না থাক তাহা হইলে তোমাকে ভয়ানক অভিশাপ দিব।" কাজেই বিন্ধ্য আর কি করেন? মাথা নত করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অগস্ত্যও আর ফিরিয়া আসিলেন না। এই উপাখ্যানটিকে মূল করিয়া আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—অগস্ত্যযাত্রা। মাসের প্রথম দিনে কোথাও গমন করিলে অগস্ত্য-যাত্রা হয়। সেদিন যাত্রা করিলে অগস্ত্যের ন্যায় আর ফিরিয়া আসিতে হয় না বলিয়াই মাসের প্রথম দিন যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

একদিন অগস্ত্য পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন একটা গর্তের ভিতরে কতকগুলি লোক রহিয়াছে। তাহাদের মাথা নীচের দিকে, পা উপরের দিকে। তাহাদিগকে দেখিয়া অগস্ত্যের প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের এইরূপ অবস্থা হইল কেন?" উত্তর আসিল—"আমরা তোমার পূর্বপুরুষ। তুমি বিবাহ কর নাই, সেজন্য আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তুমি যদি বিবাহ কর, আর তোমার পুত্র হয় তাহা হইলে আমাদের এই দুঃখের অবসান হইতে পাবে।"

এ কথায় অগস্ত্য বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার মনের মত কন্যা খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে নিরুপায় হইয়া নিজেই এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে যাহার শরীরের যে স্থানটি সকলের চেয়ে সুন্দর সেইরূপ আদর্শে সেই আদর্শকন্যার শরীর গঠিত হইল। এই কন্যা হইল অতুলনীয়া সুন্দরী। সেই কন্যা বিদর্ভ রাজার গৃহে গিয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল। রাজা তাঁহার নাম রাখিলেন লোপামুদ্রা।

লোপামুদ্রা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন অগস্ত্য আসিয়া বিদর্ভের রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিব।" ইহাতে বিদর্ভের রাজা ও রাণী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। রাজকুমারীর সহিত হইবে কি না এক দরিদ্র মুনির বিবাহ! কিন্তু এদিকে আবার ঋষির শাপের ভয়ও আছে। কাজেই তাঁহারা কি যে করিবেন সে-কথা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময় লোপামুদ্রা বলিলেন,—"আপনারা আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমাকে এই মুনির সহিতই বিবাহ দিন।" সুতরাং অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার বিবাহ হইয়া গেল।

লোপামুদ্রার চরিত্রটি আদর্শ নারীচরিত্র। বৈদিক যুগের মহিলাগণের অপূর্ব পতিভক্তি ও ত্যাগের মহিমা তাঁহার চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবাহের পর লোপামুদ্রা তপস্বিনীর বেশে স্বামীর গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজ-কন্যা হইয়াও তিনি স্বামীগৃহে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া লইলেন।

একদিকে যেমন তিনি বিদুষী ছিলেন, তেমনি ছিলেন পাতিব্রত্যের আদর্শে মহীয়সী মহিলা। স্বামিসেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোপামুদ্রা সর্ববিষয়ে সর্বকার্যে স্বামীর সহগামিনী ছিলেন। স্বামী ভোজন করিলে পর তিনি ভোজন করিতেন, স্বামী নিদ্রা গেলে পর তিনি নিদ্রা যাইতেন এবং স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই তিনি গাত্রোত্থান করিতেন। অগস্ত্যকে সেবা-দ্বারা তিনি এইরূপ ভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন যে একদিনের জন্যও তাঁহার ব্যবহারে অগস্ত্যমুনির অসন্তোষের কারণ জন্মে নাই।

অতিথিসেবায়, গৃহকার্যে, গো-সেবায় এবং আশ্রম পরিরক্ষণে তাঁহার তুল্যা নারী বৈদিক যুগেও অতি বিরল ছিল।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ লোপামুদ্রা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। লোপামুদ্রা স্বামী অগস্ত্য ঋষিকে বলিতেছেন :—

হে প্রভু! বহু বৎসর অবধি, রাত্রিদিন আপনার সেবা করিয়া এখন আমি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। জরা আসিয়া আমার দেহের সৌন্দর্য নাশ করিতেছে। তথাপি আপনার সেবাকেই আমি আমার জীবনের আনন্দ ও পরম তপস্যা জ্ঞান করিতেছি। আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয় ও গতি। আপনার সেবা দ্বারাই, আপনার তৃপ্তি দ্বারাই, যেন আমার জীবন পূর্ণ হয় এবং আমার প্রতি যেন আপনার প্রীতি ও অনুরাগ অটুট থাকে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

অদিতি

অদিতি ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন। অদিতি ইন্দ্রদেবের মাতা বলিয়া বেদে উল্লিখিত আছে। বামদেব ঋষি অদিতির পুত্র। বামদেব মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী অদিতি ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রদেব,

তাঁহার পত্নী ও ইন্দ্রের মাতার ধ্যান করিয়াছিলেন। অদিতি দেবী কয়েকটি মন্ত্র রচনা করিয়া বামদেবের অবাধ্যতা দূর করিতে পারিয়াছিলেন।

এই অষ্টাদশ সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় ইঁহারা তিনজনে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা।

অদিতি বিরচিত ঋকের মন্ত্রগুলি অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন—"অ-ল-লা এইরূপ শব্দ করিতে করিতে জলবতী নদীগণ হর্ষসূচক শব্দ করতঃ গমন করিতেছে। হে ঋষি! তুমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে উহারা কি বলিতেছে। জলসমূহ আবরক কোন্ মেঘকে ভেদ করে? অর্থাৎ জল মেঘকে ভঙ্গ করে, না, ইন্দ্রই মেঘকে বিনাশ করেন, নদীগণ তাহাই বলিতেছে।

পুবাণের মতে অদিতি কশ্যপ মুনিব পত্নী ও ইন্দ্রাদি দেবগণেব মাতা, আর তাঁহার সপত্নী দিতি দৈত্যগণের মাতা। দেবতাদের মধ্যে ও দৈত্যদের মধ্যে সম্প্রীতি একেবারেই ছিল না। হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পুত্র প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের পুত্র দৈত্যরাজ বলি বিশ্বজিৎ নামক এক যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে স্বর্গরাজ্যেব উপরও অধিকাবলাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে দেবতাদিগের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইতে হইল। দেবতাবা নিরুপায় হইয়া মাতা অদিতির নিকট শোক-প্রকাশ করিলেন, তখন অদিতি পুত্রদের দুঃখ-ক্লেশে একান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া স্বামী কশ্যপ মুনির শরণাপন্ন হইলেন।

কশ্যপ বলিলেন—"তুমি কঠোর পয়োব্রত উদ্‌যাপন পূর্বক বিষ্ণুর আরাধনা কব।" অদিতি তাহাই করিলেন। তাঁহাব কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বামনের যখন উপনয়নসময় উপস্থিত হইল, তখন বামন ব্রতভিক্ষাপ্রার্থীরূপে বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। বলি জিজ্ঞাসা করিলে—"তোমার প্রার্থনা কি বল?" বামন বলিলেন—"আমি আপনার নিকট ত্রিপাদভূমি মাত্র প্রার্থনা করিতেছি।"

বলি এই সামান্য ভিক্ষা তৎক্ষণাৎ পূরণ করতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু এ সময়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। বামনরূপী শ্রীভগবান এইবার তাঁহার খর্বাকৃতিকে বিশালতর করিলেন—তাঁহার তিনটি চরণ; একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ও শরীর দ্বারা আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি আবৃত করিয়া ফলিলেন।

তখন বলি মহা বিপদে পড়িলেন। স্বর্গ গেল, মর্ত্য গেল, সকলই যখন

অধিকার করিলেন, তাঁহার তৃতীয় পদের জন্য কোন স্থানই অবশিষ্ট রহিল না। অথচ বলি বামনের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে তাঁহাকে ত্রিপাদভূমি দান করিবেন, কিন্তু ভূমি কোথায়? তাঁহার যে আর কিছুই নাই! তখন বিপন্ন বলি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীভগবান বামনরূপে তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। বলি তখন বিনীত ভাবে করুণ কণ্ঠে বলিলেন—প্রভু! আমি ত সবই দিয়াছি, এক্ষণে আমার মস্তকমাত্র অবশিষ্ট আছে, আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।

বামন তাহাই করিলেন। বলি স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়ই দান করিয়াছেন, কাজেই স্বর্গমর্ত্যে আর তাঁহার কোন অধিকার রহিল না। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে পাতালে গমন করিতে হইল। আবার দেবতারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইলেন।

বৈদিক যুগের নারীঋষি অদিতির সহিত পৌরাণিক কালের অদিতির এই গল্পের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে তাহা অনুমান করা বিশেষ কঠিন নহে। পুরাণের অনেক কাহিনী এইরূপ ভাবে বৈদিক সামান্য আখ্যানটিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

উর্বশী

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের সাতটি ঋক্ উর্বশী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উর্বশী অপ্সরাকন্যা। এই সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরূরবা অপ্সরা উর্বশীর সহিত কিছুকাল বাস করিবার পর যখন তাঁহাদের পরস্পরের মিলনবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল, সেই সময়ের কথা ঐ সূক্তে বিবৃত হইয়াছে। পুরূরবা এবং উর্বশী উভয়ের বিদায়বেদনাবাণী অতি করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরূরবা বলিতেছেন—"হে পত্নী, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! এত শীঘ্র আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না। এই বিদায়ক্ষণে যদি মনের কথা উভয়ে প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারি তাহা হইলে চিরদিন অন্তর মধ্যে দুঃখবেদনা বহন করিতে হইবে।"

উর্বশী বলিলেন—"পুরূরবা! তুমি আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধরা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না। আমি উষার মত তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, আবার তেমনি অদৃশ্য হইয়া যাইব।"*

পুরূরবা—"তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই, জয়শ্রী লাভ হয় নাই, আমি যুদ্ধে গমন করিয়া গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই, আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করিবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করিয়াছে।"

উর্বশী বলিলেন—"তুমি আমাকে যত্ন ও সেবা করিতে বলিয়া আমি এতদিন তোমার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। তুমি নিজে মনুষ্য হইয়াও দেবলোকবাসিনী অপ্সরার প্রীতি ও প্রেম লাভ করিয়াছিলে, কিন্তু এতদিনে তাহার অবসান হইল, আমি এক্ষণে প্রস্থান করিব। হে পুরূরবা, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে আর পাইবে না।"

পুরূরবা উর্বশীর মুখে এই নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া বলিলেন—"তবে তোমার প্রণয়ী পুরূরবা আজ পতিত হউক, আর কখনও যেন সে না উঠে। সে যেন বহু দূরে দূর হইয়া যায়। সে যেন নিয়তির অঙ্কে শয়ন করে। বলবান বৃকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক।"

উর্বশী—"হে পুরূরবা! এরূপ মৃত্যু কামনা করিও না, উচ্ছন্নে যাইও না, দুর্দান্ত বৃকেরা যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে। রমণীর প্রণয় স্থায়ী হয় না। নারীর হৃদয় এবং বৃকের হৃদয় দুইটি এক প্রকার। হে ইলাপুত্র পুরূরবা! দেবতারা তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে, তুমি পুণ্যকর্ম দ্বারা দেবতা-দিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বহুদিন পরে স্বর্গলোকে গমন করিবে।"

উর্বশীর সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্পটি এইরূপ :—কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইন্দ্রের মহা ভয় হইল, বুঝি তাঁহার ইন্দ্রত্ব যায়! তখন ইন্দ্র বিষ্ণুরূপী ধর্মপুত্রের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য কামদেব ও অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করিলেন। অপ্সরারা কোনরূপেই বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিল না। তখন কামদেব আপনার উরু হইতে উর্বশীর সৃষ্টি করিলেন। উর্বশী বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ করায় ইন্দ্র তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। উর্বশীও সম্মতা হইলেন। এ সময়ে মিত্রাবরুণও উর্বশীকে কামনা করিলেন, উর্বশী কিন্তু সম্মত হইলেন না, বরং বিরাগ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে

* উর্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।

মিত্রাবরুণ অসন্তুষ্ট হইয়া শাপ দিলেন—"মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" উর্বশী মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল রাজা পুরূরবার পত্নীরূপে তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

পুরূরবা সেকালে একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। চন্দ্রবংশে তাঁহার জন্ম। বুধ ছিলেন তাঁহার পিতা। পুরূরবা যেমন ছিলেন সাহসী, তেমনি ছিলেন বীর, বিদ্বান ও দানশীল এবং দেখিতেও ছিলেন পরম রূপবান।

উর্বশী পুরূরবাকে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের সময় উর্বশীর সহিত পুরূরবা এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি কখনও পরিচ্ছদবিহীন অবস্থায় তাঁহাকে দেখা দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ শয্যাপার্শ্বে দুইটি মেষ বাঁধা থাকিবে, আর দিবসে একবার মাত্র ঘৃত পান করিয়া তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে। পুরূরবা তাহাতে সম্মত হইলেন। যেদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে সেদিনই উর্বশী পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিয়া গন্ধর্বলোকে চলিয়া যাইবেন। মহারাজা পুরূরবা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইয়া গেল।

গন্ধর্বরাজ বিশ্ববেণু উর্বশীকে শাপমুক্ত করিবার জন্য একদিন রাত্রিকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্ব হইতে মেষ দুটিকে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। পত্নীর অনুরোধে পুরূরবা বস্ত্রহীন অবস্থায়ই মেষ দুটির উদ্ধারের জন্য বাহির হইলেন। হঠাৎ বিদ্যুতালোকে উর্বশী স্বামীকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সেই মুহূর্তেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গন্ধর্বলোকে প্রস্থান করিলেন।

বিরহবিধুর পুরূরবা উর্বশীর বিরহে সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, অবশেষে কুরুক্ষেত্রের প্লক্ষ নামক তীর্থে উর্বশীর দেখা পাইয়াছিলেন। রাজার কাতরোক্তিতে উর্বশী তাঁহাকে একটি যজ্ঞ সম্পাদনের কথা বলিলেন। যদি সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বৎসরে একদিন তাঁহাদের মিলন হইবে এবং তিনি গন্ধর্বলোকে গমনের অধিকারী হইবেন। পুরূরবা প্রতিষ্ঠানপুরী নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উর্বশীর গর্ভে তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

উর্বশী সৌন্দর্যলক্ষ্মী। যুগে যুগে সেই সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে সৌন্দর্যের চিরন্তন আদর্শময়ী উর্বশীকে লাভ করিবার আশায় কত পুরূরবার হাহাকার, কত পুরূরবার বিরহকাতরবাণী, আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়াছে, কখনও সেই প্রাণময়ী সৌন্দর্যস্বরূপিনী উর্বশী পুরূরবাকে ধরা দিয়াছেন, কখনও ছলনা করিয়াছেন, তবু সেই অনাদিকাল হইতে সৌন্দর্যপ্রিয় নর নন্দনবাসিনী উর্বশীকে

লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে কেবলই চলিয়াছে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সন্ধানে, তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে :—

"ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌববশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধবাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কাব চিরবিবহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূবস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,—
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণেব ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে ॥*

---

*উর্বশী—রবীন্দ্রনাথ

উপনিষদের যুগ

বধ্রিমতী

বৈদিক যুগে বধ্রিমতী নামে একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। ঋগ্বেদের ১১৬ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্রটি রচনা করিয়াছিলেন বধ্রিমতী, তিনি সেই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। পতিপত্নী একত্র মিলিত হইয়া তাঁহারা রত্ন গোধন প্রাপ্তির কামনায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিয়া ইন্দ্রদেবের পূজা করিয়াছিলেন। অনার্যদের সহিত আর্য মহর্ষিগণের যখন সংগ্রাম চলিতেছিল, পতি যখন যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন ঋষিপত্নীরা পুরোহিতকে না ডাকিয়া নিজেরাই দৈনিক হোম ও ধর্মকর্ম করিতেন। বধ্রিমতীও ছিলেন যজ্ঞ ও হোমকর্মব্রতকারিণী বিদুষী আর্য মহিলা।

রাজ্ঞী শশীয়সী

রাজা তরন্তের রাজ্ঞী ছিলেন শশীয়সী। তিনি যেমন ছিলেন রূপলাবণ্যা ও চিরযৌবনা, তেমনি ছিলেন দয়াবতী, স্নেহময়ী, বীরাঙ্গনা। ক্ষুধার্থ পীড়িত দীন হীন জনগণের ছিলেন জননীতুল্যা—কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিত না। আবার পতি যখন যুদ্ধ করিতে যাইতেন, তখন তিনি হইতেন তাঁহার সঙ্গিনী এবং যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে এই মহীয়সী আর্য মহিলার দেবারাধনা, দান ধ্যান ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবাদিনী মিনা ও বৈতরণী

বৈদিক যুগে আর্য মহিলারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনী নারীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন। জ্ঞানানুশীলনের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। মিনা ও

বৈতরণী এই দুইজনই ব্রহ্মবাদিনী মহিলা ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন। সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও ধ্যান ধারণা করিতেন। অত্রিবংশের দুইজন সদ্যোবধূ ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন।

সদ্যোবধূরা উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতেন, তাহাদের শিক্ষা ছিল, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতি বিধানই ছিল জীবনের উদ্দেশ্য।

দেবহুতি

কর্দম মুনির পত্নী দেবহুতি ছিলেন একজন সদ্যোবধূ। চিত্তই জীবের বন্ধন মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরের সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়। অন্তরের বিশুদ্ধ নির্মলতা ও সৌন্দর্যে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন।

বীরাঙ্গনা ইন্দ্রসেনা ও সরমা

মুদ্‌গাল ঋষির পত্নীর নাম ছিল ইন্দ্রসেনা। বৈদিক যুগে গোধন ছিল আর্য পুরুষ ও নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেজন্য তাঁহারা নাম দিয়াছিলেন গোধন। তাঁহারা তাঁহাদের পালিত গোধন হইতে পাইতেন দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, নবনী ও ঘৃত। কোন অভাব ছিল না তাঁদের উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে,—কিন্তু গোধন অপহরণ করিতে আসিত অনার্য দস্যুদল।

একবার মুদ্‌গাল ঋষির গোধন দস্যুরা অপহরণ করিল। ঋষি তখন তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন, ঋষি পত্নী ইন্দ্রসেনা ছিলেন নিজগৃহে। ইন্দ্রসেনা কালবিলম্ব না করিয়া রথে আরোহণ করিলেন, সজ্জিতা হইলেন অস্ত্রে-শস্ত্রে—গোধন অবরোধকারীদের আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষের সৈন্যদের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল—অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন ইন্দ্রসেনা—তাঁহার কাছে দস্যুগণ পরাজিত হইল। শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন গোধন। ঋগ্বেদের

দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে এই আর্যনারীর রথারূঢ়া হইয়া যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে একাদশটি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলি সরমা নামে আর্য মহিলার ও পণিগণের উক্তি ও প্রত্যুক্তিতে পূর্ণ। পণিগণ বলিতেছেন—"হে সরমে, তুমি কি জন্য এত নদ-নদী ও ভীষণ অরণ্যানী অতিক্রম করে এখানে এসেছ?"

সরমা উত্তর করিলেন,—"তোমরা অসংখ্য গোধন সংগ্রহ করেছ। তোমরা অপহরণ করেছ, আমার এইসব গোধন, আমি ঐ সকল গোধন উদ্ধার করবার জন্য এসেছি। আমি যুদ্ধ করে ফিরিয়ে নেব আমার গোধন।"—সরমা যুদ্ধে বিজয়িনী হইয়া গোধন লইয়া ফিরিলেন।

মৈত্রেয়ী

বৈদিক যুগের মহিলাদেব ন্যায় উপনিষদেব যুগেও বহু বিদুষী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতেই মৈত্রেয়ীর অসাধারণ জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাওয়া যায়।

মৈত্রেয়ীর পিতার নাম মিত্র। মিত্রও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মিত্র কন্যা মৈত্রেয়ীকে অত্যন্ত যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য স্থির করিলেন সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্রে বিধি আছে যে, যদি স্বামী গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে স্ত্রী জীবিতা থাকিলে পতির পত্নীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন, তখন মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—"মৈত্রেয়ী, আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিব স্থিব করিয়াছি, এ বিষয়ে আমি তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলে তোমাদের যাহাতে কোন ক্লেশ না হয়, সেজন্য তুমি ও তোমার সপত্নী কাত্যায়নীকে আমার ধনসম্পত্তি সমুদয় সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিব। আমার প্রদত্ত সম্পত্তিতে তোমাদের অন্নবস্ত্রের কোনরূপ ক্লেশ হইবে না।"

যাজ্ঞবল্ক্য ধনবান্ ঋষি ছিলেন। মহারাজ জনকের বহু শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া তিনি বহুবার অনেক সহস্র ধেনু এবং বহু সহস্র স্বর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোনবার জনক রাজা সহস্র ধেনুর প্রত্যেক শৃঙ্গদ্বয় স্বর্ণে ভূষিত করিয়া মহর্ষিকে দান করিয়াছিলেন। এইরূপ দানও বহুবার হইয়াছিল। কাজেই যাজ্ঞবল্ক্য ধনসম্পত্তিশালী, সুখী এবং সঞ্চয়ী ও সদ্ব্যয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুণ্য তপোবনে বহু সহস্র শিষ্য অন্নবস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষালাভ করিত। এই সহস্র শিষ্যের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করা যে কত বড় ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এজন্যই ধনবান্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে পারিয়াছিলেন, "আমার প্রদত্ত ধনসম্পত্তিতে তোমাদের অন্নবস্ত্রের কোন ক্লেশ হইবে না।"

স্বামীব মুখে সম্পত্তি বিভাগেব কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী দুঃখিতা হইয়া বলিলেন—"বিবিধ ধনরত্নাদিপূর্ণ সসাগরা পৃথিবী লাভ করিলেও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। আপনার এই স্বর্ণ, আপনার এই শস্যসম্ভার পরিপূর্ণ ক্ষেত্র, আপনাব ধেনুসমূহ এবং আপনার প্রদত্ত ধনসম্পত্তিতে আমার যে প্রাণের অভিলাষ তাহা কখনও পূর্ণ হইবে না। এমন কি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আমি যদি অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন করি তাহা হইলেও আমার প্রাণের যে কামনা তাহা সিদ্ধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কেননা এই সকল যজ্ঞকার্য্যাদি অনুষ্ঠানের ফলে আমি স্বর্গে গমন করিলেও, পুনরায় পুণ্যশেষে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই আমার মনের বাসনা ত পূর্ণ হইবে না। আমি অমর হইতে ইচ্ছা কবি। আমি অমৃত প্রার্থনা করি। আমি কি চাই জান, প্রিয়তম?—পৃথিবীর সম্পদ ও ভোগবিলাসসুখেও আমার চিত্ত উন্মুখ নহে, জ্যোতির্লোক বা স্বর্গলোকেরও আমি প্রার্থিনী নহি,—আমি চাই সত্যলোক, আমি চাই জ্ঞানলোক, আনন্দলোক, আমি চাই অমৃতলোক। যে লোক লাভ হইলে মানুষের কোন বাসনা থাকে না, আমি সেই অমরত্ব লাভের জন্য সমুৎসুক। তুমি আমাকে ধন, রত্ন, গো, গৃহ ইত্যাদির লোভে মুগ্ধ করিয়া কি সামান্যা নারীর ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে? বল প্রিয়তম! এই সমুদয় পার্থিব ধনসম্পত্তি কি আমায় অমরত্ব দান করিতে পারিবে? বল প্রিয়তম! আমি কেমন করিয়া অমর হইব? আপনার প্রদত্ত এই ধনসম্পত্তি গ্রহণে ও ভোগে আমার অমরত্ব লাভ হইবে কি?"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি যদি পৃথিবীর অধিশ্বরীও হও

তাহা হইলেও তোমার অমরত্ব লাভ হইবে না। অট্টালিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, শস্যক্ষেত্র, হস্তী, ঘোটক ইত্যাদি যান, বিবিধ সুখভোগ্য খাদ্যদ্রব্য, এসকলে তোমার জীবনযাত্রা শান্তিসুখে নির্বাহিত হইবে এইমাত্র। কিন্তু মৃত্যুর পর সাধারণ মানবের ন্যায় তোমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং পুনরায় মৃত্যুর হস্তে পড়িতে হইবে। এই জন্মমৃত্যু-সম্বন্ধ একেবারে দূর হইবে না। দীনদরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে জীবনে-মরণে যেরূপ সুখদুঃখের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ অদৃষ্টে ঘটে না, তদ্রূপ তোমারও ধনী ব্যক্তির ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দতার ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত হইবে। এই লাভ ব্যতীত তোমার মুক্তিপ্রাপ্তির কোন আশা নাই—একথা নিশ্চিত জানিবে।"

মৈত্রেয়ী স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলেন—"সে সকল বস্তু দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্!" যাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, এমন দান গ্রহণ করিয়া আমি কি করিব? অতএব প্রিয়তম! আমাকে এমন উপদেশ দাও, যে উপদেশ পাইলে আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব, পরমাত্মা পরমেশ্বরে বিলীন হইতে পারিব—আমি সেই উপদেশ, সেই শিক্ষাই আপনার নিকট চাই—চাই সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সন্ধান, যাঁহার কৃপায় আমি মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে পারিব।"

যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীর কথায় প্রীতিলাভ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি আমার গার্হস্থ্যজীবনের যেমন প্রিয় অনুষ্ঠানদ্বারা আমার সন্তোষবিধান করিয়াছ, তেমনি আজ এই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণকালেও যে মধুর বাক্য দ্বারা সদুপদেশ প্রার্থনা করিয়া আমাকে আনন্দ দান করিলে ইহাতে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমি তোমাকে তাঁহারই কথা বলিব, সেই—

"মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"

তারপর যাজ্ঞবল্ক্য ধীরে ধীরে বিদুষী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মা কি? পরমাত্মা কি? ব্রহ্ম কি? কেমন করিয়া আত্মোপলব্ধি দ্বারা মানুষ আত্মদর্শনে জ্ঞানলাভ করে? কেমন করিয়া সমদৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয়, কি জ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মানবের মনে সমদৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয়? মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভ না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিলাসসুখভোগের আকাঙ্ক্ষার হাত এড়াইতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত

কোনরূপেই তাহার মন হইতে ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত নানারূপ ভেদবুদ্ধি আসিয়া তাহার মনকে সংকীর্ণ করিয়া তোলে। যখন মানুষ সমদৃষ্টি লাভ করে, সমজ্ঞান লাভে সমদর্শী হয়, তখন তাহার কাছে সমুদয় বিশ্বজগৎ, সমুদয় বিশ্বপ্রাণী একান্ত আপনার হয়। তখন সেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিসম্পন্ন, জ্যোতির্ময় ভগবানের নিকট হইতে কোন পার্থিব বস্তুই বস্তুরূপে পরিলক্ষিত হয় না।

এই ভাবে ধীরে ধীরে যাজ্ঞবল্ক্য নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বিশ্বভগবানের রূপ, প্রকাশ ও বিকাশ সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীকে বিবিধ উপদেশ দান করিতে লাগিলেন।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি যুক্তি ও আলোচনা শুধু নীরবে মানিয়া নেন নাই। তিনি প্রত্যেকটি বিষয় সমালোচনা করিয়া, স্বামীকে প্রশ্ন করিয়া, বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন বলিলেন—"প্রিয়তমে! সূর্যের প্রকাশের জন্য যেমন সূর্যের প্রয়োজন হয় না, তেমন যিনি বিশ্বদেবতা, যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, যিনি বাক্যমনের অতীত তাঁহাকে উপলব্ধি মানুষ কখন করিতে পারে? যখন মানুষ আপনাকে এমন অবস্থায় উন্নত করে যে, বিশ্বদেবতার সহিত তাহার মিলন সম্পাদিত হয়, তখন তাহার আর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তখন একমাত্র সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ জ্ঞানময় মুক্ত পরমাত্মা বিদ্যমান থাকেন, মানুষ যখন জ্ঞান-বৈরাগ্যের মণিকাঞ্চন সংযোগে মুক্ত হইয়া যায়, যখন সেই বিশ্বপ্রাণের সহিত তাহার মিলন হয় তখন সে জন্ম-মরণ-বিরহিত হইয়া পরমপদ লাভ করে, তাহার সমুদয় বাসনার নির্বাণ হয়।"

মৈত্রেয়ী স্বামীর নিকট এইরূপ ভাবে উপদেশ লাভ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। তিনিও স্বামীর সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। সেদিন হইতে সংসারে অনাসক্ত হইয়া মৈত্রেয়ী মুক্তিপথাবলম্বিনী হইলেন।

সেদিন সেই অতীত যুগে ভারতের পুণ্য তপোবনে মৈত্রেয়ীর ন্যায় বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী নারী জন্মগ্রহণ করিয়া যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্তমান সময়েও নারীসমাজের আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। কি গৃহকার্যে, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে, কি বিদ্যালোচনায়, কি ধর্মালোচনায়—সকল বিষয়েই তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী

বচক্রু ঋষির পুণ্য-তপোবনে শিষ্যেরাও যেমন ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তেমনই তাঁহার কন্যা বাচক্রবীও বিদ্যার্থিগণের সহিত একত্রে বিদ্যালাভ করিতেন। এই বাচক্রবীই গার্গী নামে পরিচিতা। প্রাচীনকালের আর্যমহিলাগণের মধ্যে তাঁহার নাম চিররবণীয়া ও চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছে। গার্গী কি বেদ, কি বেদান্ত, কি উপনিষদ, সর্ব বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানবতী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মবাদিনী উপাধি দিয়াছিলেন।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সহিতও নির্ভীকভাবে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স বেশি ছিল না, তিনি তখন তরুণী ছিলেন। গার্গী এইরূপ তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন যে, কোন ঋষির সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে যে পর্যন্ত না কোন সুমীমাংসা হইত সে পর্যন্ত তিনি কোনরূপেই নিবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার তর্ক করিবার শক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং যুক্তির অবতারণা দেখিয়া ঋষিরা আনন্দ লাভ করিতেন এবং তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। গার্গী এইরূপ তর্কবিতর্কের মধ্যেও আপনার নারীজনসুলভ বিনয় ও নম্রভাব একটুকু ত্রুটি করিতেন না। এজন্য ঋষিরা তাঁহার প্রতি সকলেই স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠব্রাহ্মণ নামক অধ্যায়ে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন হইতে গার্গীর শাস্ত্রজ্ঞান যে কিরূপ প্রখর ও গভীর ছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

এখানে আমরা গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। গার্গী একবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উপনিষৎ বলেন—পৃথিবী জলের উপর বিরাজমান, একথা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়, কেনন পৃথিবী খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। অতএব পৃথিবী জলের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব জল হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে—জলই পৃথিবীর উপকরণ ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মহর্ষি, এই জল কাহার উপর অবস্থিত?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"জল বায়ুর উপর অবস্থিত। কারণ বায়ুই জলের উপাদান।"

গার্গী—বায়ু কাহার উপর অবস্থিত?

যাজ্ঞবল্ক্য—বায়ু আকাশে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত।

গার্গী—আকাশ বা অন্তরীক্ষের অবস্থান কোথায় ?

যাজ্ঞ—গন্ধর্বলোকে অবস্থিত।

গার্গী—গন্ধর্বলোক কোথায় বিরাজমান ?

যাজ্ঞ—আদিত্যলোকে বিরাজিত।

গার্গী—আদিত্যলোক কোথায় অবস্থিত ?

যাজ্ঞ—চন্দ্রলোকের উপর বিরাজমান।

গার্গী—চন্দ্রলোক কাহার উপর অবস্থিত ?

যাজ্ঞ—চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকের উপর অবস্থিত।

গার্গী—নক্ষত্রলোকের অবস্থান কোথায় ?

যাজ্ঞ—ইন্দ্রলোকের উপর।

গার্গী—ইন্দ্রলোক কোথায় ?

যাজ্ঞ—ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকের উপর।

গার্গী—প্রজাপতিলোক কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ—ব্রহ্মলোকের উপর বিরাজিত।

গার্গী—ব্রহ্মলোক কোথায় অবস্থিত ?

এইবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"বৎসে গার্গী ! তুমি আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। ব্রহ্মলোক কাহারও উপর অধিষ্ঠিত নহে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই আশ্রয়ে বিদ্যমান। ব্রহ্মলোককে আশ্রয় করিয়া সকল লোক অবস্থান করিতেছে।"

সেকালে রাজর্ষি জনকের অপূর্ব মনীষা ছিল ভারতবিখ্যাত। জনক রাজা বিবিধ শাস্ত্রীয় মীমাংসার জন্য তাঁহার সভায় মহাজ্ঞানী মহা-ঋষিদিগকে আহ্বান করিতেন। তাঁহার সভায় ব্রহ্ম কি, পরলোক কি, মানবের শেষ পরিণতি কি, সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। ঐ আলোচনাসভায় একদিকে যেমন জনকরাজা পুরুষদিগকে আহ্বান করিতেন, তেমনি নারী ঋষিদিগকেও নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিতেন না। পুরুষ ও নারী ঋষিগণ সভাস্থলে পরস্পর তর্কবিতর্ক, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসা করিতেন। তর্কসভার পরিসমাপ্তির পর উভয়জাতীয় পণ্ডিতেরাই যথাযোগ্য ভাবে অভিনন্দিত হইতেন এবং উপহার লাভ করিতেন।

একবার রাজর্ষি জনক এক বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই বিরাট যজ্ঞক্ষেত্রে কুরু ও পাঞ্চাল দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

রাজা ব্রাহ্মণদের দান করিবার জন্য এক সহস্র ধেনু রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি ধেনুর শৃঙ্গে দশ দশ পাদ সুবর্ণও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। রাজর্ষি জনক সকল পুরুষ ও নারী ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে সমবেত হইলে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠতম, তিনি কৃপাপূর্বক এই ধেনুসকল নিজগৃহে প্রণয়ন করুন।"

যজ্ঞস্থলে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। ঋষিগণ কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। কে গাভী গ্রহণ করিবেন? কে আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠতম বলিয়া পরিচয় দিবেন? বহুক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যদিগকে ঐ সহস্র ধেনু গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ যাজ্ঞবল্ক্যের আদেশে গাভীগুলি লইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে গমন করিলেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজর্ষি জনকের পুরোহিত বজ্রগম্ভীর-কণ্ঠে যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি কি মনে করেন যে আপনি এই যজ্ঞভূমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? আপনি ব্রহ্মিষ্ঠতম—এই কি আপনার বিশ্বাস?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আমি এমন আস্পর্ধা করিতেছি না। আপনারা সকলে ব্রহ্মিষ্ঠ। তবে আমার ধেনুগুলি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী, তাই আমি এইগুলিকে গ্রহণ করিলাম।"

অশ্বল তেজস্বী এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার উপর তিনি আপনাকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রুদ্ধ অশ্বল এইবার যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

উভয়ে তর্ক আরম্ভ হইল। অশ্বল প্রথমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সে সমুদয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন। অশ্বল নীরব রহিলেন। অশ্বলের পরে আর্তভাগ, কহোল প্রভৃতি আরও কয়েকজন ঋষি তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারাও পরাজয় স্বীকার করিলেন। এই পরাজয়ের পর আর কোন ব্রাহ্মণই যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু অগ্রসর হইলেন—মহীয়সী বিদুষী মহিলা গার্গী।

যজ্ঞসভাতলে এই তেজস্বিনী মহিলার অপূর্ব প্রতিভামণ্ডিত বদনশ্রী এবং সাহস দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ আশ্চর্য হইলেন। গার্গী প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও আশ্চর্য শাস্ত্রজ্ঞান

দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। রাজর্ষি জনকের সভাস্থলে একজন মহিলাকে ব্রাহ্মণগণের স্বীকার করিয়া লইতে হইল—শ্রেষ্ঠতম ও ব্রহ্মিষ্ঠতম।

দেবহুতি

বিদুষী দেহহুতি রাজা স্বায়ম্ভুব মুনির কন্যা। ইহার জননীর নাম শতরূপা। দেবহুতির ভ্রাতা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দুইজনেই প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। দেবহুতি শৈশব হইতেই আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, সেজন্য পিতা মনু তাঁহার সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এই বিদ্যানুরাগিণী মহিলার সুনাম সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

কর্দম নামে একজন ঋষিযুবকের এই সময়ে অত্যন্ত বিদ্যার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। দেবহুতির এমনই বিদ্যানুরাগ ছিল যে তিনি কোনও রাজপুত্রকে বিবাহ না করিয়া কর্দম ঋষিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। জ্ঞানলাভের চরিতার্থতাই ছিল ইহার একমাত্র কারণ।

কন্যার ইচ্ছানুরূপ বরের সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য রাজা স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম-আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এই সময়ে কর্দম ঋষি ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে রাজা মনুর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে দীনদরিদ্র ঋষির সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল।

দেবহুতি রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর শান্ত নির্জন তপোবনে আসিলেন। তাহার প্রাণে ঐশ্বর্য বা বিলাসের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আকাঙ্ক্ষা ছিল শুধু জ্ঞানের প্রতি। এইবার স্বামীর নিকট হইতে তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে গৃহকর্ম করিতেন, অপর দিকে স্বামীর সহিত জ্ঞানানুশীলন করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের জীবন জ্ঞানে ও প্রেমের অপূর্ব সুষমায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

তাঁহাদের নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যাদের মধ্যে অনসূয়া ও অরুন্ধতীর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর সতীত্ব ও পবিত্রতার কাহিনী আমাদের দেশে চিরন্তন আদর্শ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখনও বিবাহকালে কন্যা বলিয়া থাকেন—"প্রার্থনা কবিতেছি, দেবী অরুন্ধতী, আমি যেন তোমাব ন্যায় পাতিব্রত্যধর্মে গবীয়সী থাকি।" অনসূয়াব সহিত পবিণয় হইয়াছিল অত্রি ঋষিব। অনসূয়াও একজন শ্রেষ্ঠা গুণবতী মহিলা ছিলেন, আব অত্রিঋষি ছিলেন একজন খ্যাতনামা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি।

যে কপিলমুনিব সাংখ্যদর্শন পৃথিবীব সর্বত্র পবিচিত, যে কপিল অসাধাবণ জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত বলিয়া আজ পর্যন্ত পবিকীর্তিত হইযা আসিতেছেন, সেই কপিল মুনি এই দেবহুতিব গর্ভেই জন্মগ্রহণ কবেন।

পুত্রকে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী কবিবাব জন্য এই মহীযসী মহিলা যে অক্লান্ত শ্রম ও যত্ন কবিযাছিলেন তাহা আশ্চর্য বলিতে হইবে। কপিল জ্ঞানেব পুণ্যধাবা দ্বাবা মানবেব মুক্তিপথেব অনুসন্ধান কবিযাছিলেন। সেই প্রবণাব মূলসূত্র, মূল আদর্শ ও শিক্ষা জননীব শুভ্র সুন্যধাবাব সহিত তাহাব জীবনে অন্তর্নিহিত হইযাছিল।

জ্ঞান, শিক্ষা এবং ত্যাগেব জন্য দেবহুতিব নাম মহিলাকুলেব আদর্শস্থানীয হইযা থাকিবে।

পৌরাণিক যুগ

মদালসা

আমরা এখানে যে বিদুষী মহিলার কথা বলিব, তাঁহার জীবনকথা অতি মনোরমকাহিনী-সংবলিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যান হইতে আমরা প্রথমে মদালসার গল্পটি বলিয়া লইব, পরে সেই পৌরাণিক যুগে মদালসা, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মনীতি হিসাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। পৌরাণিক যুগে প্রাচীন ভারতে গার্হস্থ্যজীবন কিরূপ ছিল, ভারতবর্ষের রাজধর্ম কিরূপ ছিল, বর্ণাশ্রমধর্ম কিরূপ ছিল, তাহার অতি সুন্দর আলোচনা আছে। সেই আলোচনার মধ্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেননা এই উপদেশগুলি বিদুষী মদালসার প্রদত্ত। এখন আমরা মদালসার জীবনকথার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

—এক—

অতি প্রাচীনকালে শত্রুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা পুণ্যবান, দানশীল এবং বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। শত্রুজিৎ রাজার যজ্ঞে ইন্দ্র অজস্র সোমরস পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন রাজা সভাস্থলে বসিয়া আছেন এমন সময় গালব ঋষি একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন—"কোন দৈত্য পশু-পক্ষীর রূপধারণ পূর্বক আমার তপোবনে প্রবেশ করিয়া নানারূপ বিঘ্ন করিয়া থাকে। ইহাতে আমার ধ্যানের বিঘ্ন হয়। আমি ইহার প্রতিকার করিতে পারি—তপঃপ্রভাবে ইহাকে ভস্মীভূত করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার তপঃপ্রভাব হ্রাস পাইবে, সেজন্য আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজার প্রধান ধর্ম প্রজাপালন, শিষ্টরক্ষণ এবং দুষ্টদমন, অতএব আপনি ইহার প্রতিকার করুন।

"মহারাজ! এই যে অশ্বটি আমি আপনার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি, এই অশ্বটি আমি দৈবক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। একদিন দৈত্য আমাকে ভীষণ ক্লেশ দিতেছিল, তাহাতে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম—তৎক্ষণাৎ গগনমণ্ডল হইতে এই অশ্বটি আমার আশ্রমে নিপতিত হইল। সেই সঙ্গে দৈববাণী শুনিতে পাইলাম—"এই অশ্ব ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে পারিবে। আকাশ, পাতাল, সমুদ্র,

সর্ব্বত্র ইহার অবিরাম গতি। সূর্যদেব তোমাকে এই অশ্ব দান করিয়াছেন। ইহার নাম কু-বলয়। কু-বলয় শব্দে ভূমণ্ডল বুঝায়। এই অশ্ব ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে পারিবে বলিয়া এই অশ্বের নাম হইবে কু-বলয়। হে ঋষি গালব! মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র কুমার ঋতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ করিয়া দুষ্ট দানবকে বধ করিতে পারিবেন। এই অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া কুমার ঋতধ্বজও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত হইবেন।

"মহারাজ, এই দৈববাণী শুনিয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই অশ্ব-রত্ন আমি আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি যথাকর্তব্য করুন।"

রাজা শত্রুজিৎ ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ঋতধ্বজকে যথাবিহিত অভিনন্দিত করিয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন পূর্বক মহর্ষি গালবের সহিত তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

—দুই—

কুবলয়াশ্ব ঋষি গালবের আশ্রমে আসিয়া তপোবন রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ঋষিপত্নীগণ প্রীতিলাভ করিলেন। ঋষিকুমারীদিগকে তিনি ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। কয়েকদিন চলিয়া গেল, কিন্তু দানবের দেখা নাই। কুবলয়াশ্বের এই সময়ে একমাত্র চিন্তা মনের মধ্যে জাগরূক ছিল, কবে কেমন করিয়া সেই দুর্দান্ত দানবকে বিনষ্ট করিয়া আশ্রমবাসী পুণ্যতপা ঋষিগণের দুঃখ-ক্লেশ নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরুপদ্রব করিতে সমর্থ হইবেন।

একদিন সেই ভীষণ দানব শূকরমূর্তি ধারণ করিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঋষি গালব সন্ধ্যাপূজাদি কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এমন সময় শূকররূপী দানব মহর্ষী গালবকে আক্রমণ করিল। শান্তস্তব্ধ পুণ্যতপোবন ঋষিপত্নীগণের করুণ আর্তনাদ ও মুনিবালকগণের কাতর ক্রন্দনে মুখরিত হইয়া উঠিল। কুবলয়াশ্ব মুহূর্তমধ্যে মায়া-বরাহের পশ্চাতে তীরধনুক সহকারে গমন করিলেন, এবং একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া শূকরকে বিদ্ধ করিলেন। শরের আঘাতে আহত হইয়া শূকর নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল, কুবলয়াশ্বও তাঁহার অশ্বে আরোহণ পূর্বক দানবের অনুসরণ করিলেন। বরাহ বহু পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিল। কুবলয়াশ্বও তাঁহার মায়া-অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই ঘনতমসাবৃত পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

—তিন—

পাতালপুরী। সেখানে সূর্যের কিরণদীপ্তি ফুটিয়া উঠে না। চন্দ্র তারকার শুভ্র দ্যুতিও বিকশিত হয় না। অথচ সে প্রদেশে অন্ধকার নাই, সেখানে মেঘ নাই, কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ নাই, অমাবস্যা-পূর্ণিমা নাই। সেখানে শত শত মণি-মাণিক্যের দীপ্তি। একটি স্নিগ্ধ অথচ পরিস্ফুট আলোকে সেই অধোরাজ্য উদ্ভাসিত। সেই প্রদেশের সেই পাতালপুরের রাজধানীতে সুন্দর এক হিরণ্ময় প্রাসাদের সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে দুইটি অপূর্ব লাবণ্যময়ী তরুণী—যেন মেঘবৃতা জ্যোৎস্নার ন্যায় মলিনা—বসিয়া ছিলেন। একজন বিধবা, অপরা কুমারী। কুমারী বিধবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সখি! আজই যে শেষ দিন। এখনই যে দৈত্য আসিয়া আমার সর্বনাশ করিবে। কি হইবে—কি করিব বল?"

বিধবা কুমারী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। তিনি ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কোন ভয় করিও না। যিনি সতীর গৌরব রক্ষা করেন, সেই দেবতাই তোমাকে রক্ষা করিবেন। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু তোমাকে সাময়িক ভাবে সান্ত্বনা দিবার স্তোকবাক্য মাত্র নহে।"

সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের একপার্শ্বে এক সুবৃহৎ তাম্রময় কুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছিল।

কুমারী বলিলেন,—"আমি এই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিব, তবু—তবু দুষ্ট দানবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিব না।" বিধবা কহিলেন—"আমার জীবন থাকিতে আমি কখনই তোমাকে এইরূপ কার্য করিতে দিব না!"

কুমারী কি করিলেন জান? তিনি দেখিলেন যে শুধু কথার জাল বুনিয়া চলিলে কখনই চলিবে না, কাজেই আত্মবিসর্জন করাই স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে কুলদেবতাকে স্মরণ করিলেন, মনে মনে অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। দেখিলেন সখী—সেই বিধবা নারী—মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এই তো সুযোগ! ইহা মনে করিবা কুমারী আর এক মুহূর্ত মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন।—কিন্তু তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না! কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আলিঙ্গন করিল।

কুমারী সভয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন এক অপ্সরার ন্যায় রূপবতী নারী তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। কুমারীর সর্বাঙ্গ পাংশুবর্ণ হইয়া

গেল, তিনি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। আগন্তুক রমণী সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন—"মদালসা, তুমি কোন ভয় করিও না। আমি দেবমাতা সুরভি। আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এই দুষ্ট দানব তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি আর অল্পকাল অপেক্ষা কর। পৃথিবীর এক রাজপুত্র এই দুষ্ট দানবকে শরবিদ্ধ করিয়া এই পাতালপুরীতে প্রবেশ করিবেন, এবং তোমাকে বিবাহ করিবেন। আজ যদি দুষ্ট দানব তোমার নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে মিষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রাখিও।" এই বাক্য বলিয়া দেবমাতা সুরভি প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ও সেই বিধবা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন — আশ্বস্তা হইলেন।

এদিকে কুবলয়াশ্ব মায়া-বরাহের অনুসরণ করিতে করিতে পাতালনগরে সেই তরুণীদ্বয় যে প্রাসাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে গিয়া উপনীত হইলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাদের কক্ষবাতায়ন-পথে এক অজ্ঞাত তরুণ যুবককে দেখিতে পাইয়া কুমারী মদালসার প্রাণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। কুমারীর সংযমশিক্ষা কোথায় অন্তর্হিত হইল; মনে পড়িল দেবমাতা সুরভির বাক্য। মদালসা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে তাহার সখীও পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলেন।

সখী প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন মদালসা মূর্ছিতা। তাহার জ্ঞানোৎপাদন করিলে মদালসা বলিলেন—"বুঝি আমার ধর্মরক্ষা হইল না। দেবমাতা সুরভি বলিয়াছিলেন দানবঘাতক রাজপুত্র আমার স্বামী হইবেন, কিন্তু সখি! ঐ দেখ বাতায়নপথে কে ঐ সুন্দর তরুণ তাঁহার অপূর্ব মূর্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—আমার মন যে উঁহার প্রতিই আসক্ত হইয়া পড়িল। —তবে আমি কি শেষটায় ধর্মচ্যুত হইব?"

সখী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া যুবকের পরিচয় জানিবার জন্য বাহিরে গমন করিলেন। কুবলয়াশ্ব পাতালপুরীতে আসিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। কোথায় আসিলেন? নীরব ঘুমন্ত পুরী, জনমানবহীন। এক্ষণে এই যুবতীকে দেখিতে পাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং রমণী নিকটে আসিলে রাজপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! আপনি কি এইদিকে একটা বরাহকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন?" মদালসার সখী রাজপুত্রের নিকট হইতে এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কৌশলে নানারূপ জিজ্ঞাসা-দ্বারা কুবলয়াশ্বের সমুদয় পরিচয়ই জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার প্রাণে আনন্দ হইল।

বুঝিলেন এতদিনে সখীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। সুরভি যাঁহার সহিত মদালসার বিবাহ হইবে বলিয়াছিলেন এই সেই ব্যক্তি।

পুনরায় রাজকুমার রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুচরিতে! বরাহ কোথায় গেল বলিলেন না ত?"

রমণী কহিলেন—"রাজকুমার! সেই বরাহরূপধারী দৈত্য আপনার শরে বিদ্ধ হইয়া স্বীয় গুপ্তগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আপনি শীঘ্র তাহার সন্ধান পাইবেন না। বরাহের উদ্দেশ্যে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এখন আমাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া শ্রম অপনোদন করুন।"

কুবলয়াশ্ব আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হইয়া সেই রমণীর সহিত মদালসার প্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

মদালসা সহসা তাঁহারই কক্ষমধ্যে তাঁহার কল্পিত রাজকুমারকে দেখিতে পাইয়া লজ্জা ও আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কি যে করিবেন, কেমন করিয়া যে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, তাহাই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজকুমারের মত প্রার্থিত অতিথিকে সাদরে অভিনন্দিত করিলেন।

—চার—

রাজপুত্র কুবলয়াশ্ব রাজকুমারীর অসামান্য রূপমাধুরী, লজ্জারক্তশোভন কপোল, ভ্রমরকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশকলাপ, ক্ষুদ্র শুভ্র সুন্দর ললাট এবং পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীর ন্যায় দেহের প্রভা সুবিশাল নয়নযুগল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার পূর্বপরিচিতা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের পরিচয় জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে, দয়া করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করুন।"

তখন মদালসার সখী বলিলেন—"এই কুমারী গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা। ইহার নাম মদালসা। আমি মদালসার সখী, আমার নাম কুণ্ডলা। শুম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া আমার স্বামী পুষ্করমালীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি তীর্থ-পর্যটন করিয়া সময় অতিবাহিত করি। যাহাকে আপনি বাণবিদ্ধ করিয়াছেন, সেই দুরাত্মা দানব পাতালকেতু একদিন মায়াজাল বিস্তার করিয়া গন্ধর্বরাজের উদ্যান হইতে আমাদিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। এই দুদান্ত দানব আমার সখীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। এতদিন পর্যন্ত বৎসরকাল স্থায়ী অগ্নিব্রত

আছে, ব্রত সমাপনান্তে শুভবিবাহ হইবে বলিয়া মদালসা ঐ দুষ্ট দৈত্যকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই যে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে সুবৃহৎ তাম্রকুণ্ড মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতেছেন তাহা ব্রতের অনুষ্ঠান স্বরূপ দৈত্যকে বঞ্চিত করিবার জন্যই রাখা হইয়াছে। আজ বৎসরের শেষদিন, এজন্য ধর্মরক্ষার জন্য সখী অনলকুণ্ডে আত্ম-সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এইরূপ সময় দেবমাতা সুরভি উপস্থিত হইয়া সখীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন, 'দানব পাতালকেতু তোমার স্বামী হইবে না। এক রাজপুত্র এই দানবকে শরবিদ্ধ করিয়া এখানে আসিবেন, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন।' সেই আশার দীপ্তিটুকু হৃদয়ের গোপন কোণে লুকাইয়া রাখিয়া সখী তাঁহার জীবন-রক্ষা করিতেছেন। কথা আছে আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে আমার সখী মদালসার সহিত দানব পাতালকেতুর বিবাহ হইবে।"

এইভাবে রাজপুত্রকে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া সখী মদালসাকে বলিলেন —"সখী! ইনিই সেই রাজপুত্র, যিনি দানব পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করিয়া এই পাতালপুরীতে আগমন করিয়াছেন।"

পরে কুণ্ডলা বলিলেন—"বিধাতার বিধান অখণ্ডনীয়। আপনি আমার সখী মদালসাকে বিবাহ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করুন, আর আমাকেও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি দিন। সখীর শুভবিবাহ হইলেই আমি পুনরায় ধর্মচর্যায় মনোনিবেশ করিব। আর আমার সখীও আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। এই গন্ধর্বরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে কে না আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিবে? এই শিরীষকুসুমকোমলা, এই অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী নারীকে কাহার না প্রিয়তমা করিতে ইচ্ছা হয়? আপনার মত স্বামী আমার সখী মদালসারই উপযুক্ত।"

ঋতধ্বজ বলিলেন—"কুণ্ডলে! তোমার সখীকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয়মধ্যে যে প্রলয়ের ঝড় উপস্থিত হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। আমার ইচ্ছা হইতেছে এই মুহূর্তে গন্ধর্বরাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করি। কিন্তু আমি অধীন—আমার পিতা বর্তমান, আমি পিতার অনুমতি ব্যতীত এই বিবাহ করিতে পারি না।" কুণ্ডলা বলিলেন—"দিব্যবিবাহে অনুমতির প্রয়োজন হয় না।" কুবলয়াশ্ব নীরব রহিলেন। মদালসার হৃদয় সুখ ও দুঃখের, হর্ষ ও বিষাদের দোলায় দুলিতে লাগিল।

বুদ্ধিমতী কুণ্ডলা বলিলেন—"এজন্য আপনার চিন্তিত হইবার কোন কারণ

নাই। আমাদের কুলগুরু আমাদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন। আমরা এক্ষণই তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি।" কুণ্ডলা সেই মুহূর্তে তাঁহাদের কুলগুরু তুম্বুরুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কুণ্ডলা কুলগুরু তুম্বুরুর নিকট সমুদয় অবস্থা সবিস্তারে বলিলেন। মদালসা যে রাজকুমারের প্রতি অনুরক্তা, এবং রাজকুমারও যে মদালসার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন সে সব কথা প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিলেন—"কিন্তু গুরুদেব, রাজ-কুমার তাঁহার পিতার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিবেন না। এমন অবস্থায় আপনার দয়া ব্যতীত যে কিছুই হইতে পারে না।"

তুম্বুরু বলিলেন—"কুণ্ডলে! আমি সমস্তই জানি। আমি এখনই মহারাজ শত্রুজিতের নিকট গমন করিয়া ইহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতেছি। মুনিবর তুম্বুরু দিব্যগমন-প্রভাবে পৃথিবীতে গমন করিয়া মহারাজ শত্রুজিতের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তারপর পাতালপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। যথাবিধি মদালসা ও কুবলয়াশ্বের বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল।

ঋতধ্বজ মদালসাকে লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেই মায়ারূপী বরাহের আর কোনও সন্ধান পাইলেন না। তিনি প্রফুল্লচিত্তে মদালসাকে লইয়া তুরঙ্গারোহণে রাজধানীর দিকে—মর্ত্যভূমে—যাত্রা করিলেন।

কুবলয়াশ্ব ও মদালসা যেমন পাতালপুরী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, অমনি দানবগণ তাহা জানিতে পারিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শূল, শেল, মুষল, মুদ্গর, কত কি তাহারা নিক্ষেপ করিল, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজের নিকট তাহাদের সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। রাজপুত্র একাই সমুদয় দানবদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তারপর তুরঙ্গারোহণে মদালসা-সমভিব্যাহারে পিতৃ-ভবনে যাইয়া পৌঁছিলেন। মহারাজ শত্রুজিৎ রাজ্যময় আনন্দোৎসব করিয়া বীরপুত্র ও অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী অশেষ গুণবতী পুত্রবধূ মদালসাকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন।

—পাঁচ—

মদালসার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি—প্রতিদিন প্রভাতে তাঁহাদের পাদবন্দন, গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, দাসদাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার—রাজ-পুরীর সকলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

এইভাবে দেখিতে দেখিতে স্বামী ও স্ত্রীর অপূর্ব প্রণয়লীলায় দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। হঠাৎ পুনরায় একদিন এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ঋষিকুমার আসিয়া মহারাজ শত্রুজিৎকে বলিলেন—"মহারাজ, আমরা পুনরায় দৈত্যের দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত হইতেছি, আমাদের কুলপতি যজ্ঞ করিবেন, কিন্তু দানবদের পীড়নভয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না; আপনি শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করুন।" মহারাজ অমনি পুত্র ঋতধ্বজের প্রতি পুনরায় দানব নিপীড়নের ভার অর্পণ করিলেন। কুবলয়াশ্ব তৎক্ষণাৎ ঋষিকুমারের সহিত দানব-দলনের জন্য অগ্রসর হইলেন।

যমুনাতীর। তপোবনের চারিদিকে শ্যামল-সুন্দর-সবুজ-বনশ্রী। ঋষিকুমারদের বেদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। পর্ণকুটীরে কুলপতি বৃদ্ধ মহর্ষি ধ্যাননিমগ্ন। এই কুলপতি আর কেহই নহে, সেই দৈত্য পাতালকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মায়াবলে তপোবন নির্মাণ করিয়া মুনির রূপ ধারণ করিয়াছে। ইচ্ছা—কৌশলে জ্যেষ্ঠহন্তা কুলবৈরী কুবলয়াশ্বের প্রাণবধ করিবে।

কুবলয়াশ্ব তপোবনে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশী ঋষিকে প্রণাম করিলে কালকেতু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"রাজকুমার, আমি একটি যজ্ঞ করিব স্থির করিয়াছি, এই যজ্ঞ সম্পাদনে বহু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আমার সেই অর্থ নাই, আপনি আমাকে সেই অর্থ প্রদান করিলে এবং আশ্রম রক্ষার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে ও নির্বিঘ্নে এই শুভকার্যে ব্রতী হইতে পারি। অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে এই যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে।"

ঋতধ্বজ এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মণিময় হার উন্মোচন করিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—"যতদিন পর্যন্ত না যজ্ঞ শেষ হয়, ততদিন আমি আপনার আশ্রম রক্ষাকার্যে ব্রতী হইব।"

ইহাতে কপট ঋষি আনন্দিত হইয়া কহিলেন—"আমি পঞ্চদশ দিন এই কুটীরমধ্যে সমাধিস্থ থাকিব, তৎপরে যজ্ঞকার্য আরম্ভ হইবে। রাজপুত্র, তুমি এই পঞ্চদশ দিন রাত্রিকালে আমার আশ্রম রক্ষা করিবে।" পরদিন প্রত্যূষে ঋতধ্বজ দেখিলেন কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। বুঝিলেন—তপস্বী সমাধিস্থ রহিয়াছেন। তাঁহার মনে কোন সন্দেহ আসিল না। এদিকে কালকেতু সেই কণ্ঠভূষণ লইয়া আসিয়া শত্রুজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনার পুত্র আমাদের রক্ষার জন্য দৈত্যসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন। ঋষিগণ তাঁহার শেষকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অন্তিম সময়ে তাঁহার এই হার আমার হস্তে প্রদান

করিয়া আপনাদের নিকট মৃত্যু-সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। এই দারুণ সংবাদ প্রদান করিবার জন্য হতভাগ্য আমাকে আবার আপনাদের নিকট আসিতে হইয়াছে।"

মহারাণী একথা শুনিয়া শোকে মগ্ন হইলেন। মদালসা সেই শোক-সংবাদে জীবন বিসর্জন দিলেন। রাজা শত্রুজিৎ পাষাণের ন্যায় স্পন্দহীন ভাবে এই শোক-দৃশ্য দেখিলেন, তারপর একটু সুস্থ হইয়া—একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া—সকলকে বলিলেন—

"হে প্রিয় আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণ! আমি এতক্ষণ মায়ামোহে আচ্ছন্ন ছিলাম, আমার সেই মায়া অন্তর্হিত হইয়াছে। তোমরাও আর মায়াচ্ছন্ন হইয়া থাকিও না। আমার পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য শোক করিও না।"

রাজকুমার ঋতধ্বজ এ সকলের কিছুই জানিতেন না। তিনি আশ্রম রক্ষায় ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় কালকেতু যমুনাতটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"রাজপুত্র! আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। তুমি এখন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে পার। আমি তোমার পরিচর্যায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।"

—ছয়—

ঋতধ্বজ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে মহর্ষি গালবের পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। গালবের পুত্র এই মায়া আশ্রমের কাহিনী প্রচার করিলেন। রাজকুমারের হৃদয়ে তখন একটা অমঙ্গলাশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। পাছে মদালসার কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে তিনি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং কিরূপে কেমন করিয়া দুর্দ্দান্ত কালকেতুকে বিনাশ করিতে পারেন সেইজন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

কুবলয়াশ্ব কালকেতুর সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তারপর প্রফুল্লচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা ও রাণী মৃত পুত্রকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া আনন্দলাভ করিলেন, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহার প্রাণের প্রাণ প্রিয়তমা মদালসা? পরে সবই বুঝিলেন, সবই শুনিলেন। পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে বিবিধ মতে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন,

কিন্তু কেহই তাঁহার প্রাণের সেই অরুন্তুদ বেদনা দূর করিতে পারিলেন না। দিবারাত্র ঋতধ্বজের কণ্ঠ হইতে শুধু এই বাণী বহির্গত হইত—"ব্রহ্মলোক চাহি না, স্বর্গ চাহি না, মুক্তি চাহি না; আমি মদালসাকে চাই, জীবনের পরপারে, যেন তাহার সহিত মিলিত হইতে পারি।"

—সাত—

নাগরাজের পুত্রগণ ছিলেন ঋতধ্বজের পরম বন্ধু। তাঁহারা বন্ধুর এই বিরহজ্বালা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পিতা নাগরাজকে বলিলেন—"যেরূপেই হয় আপনাকে বন্ধুর সহিত তাঁহার পত্নীর মিলন করিয়া দিতে হইবে।" নাগরাজ পুত্রদ্বয়কে কোনরূপে নিরস্ত করিতে না পারিয়া হিমালয়ের নিভৃত এক গিরিশৃঙ্গে তপস্যা করিতে বসিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার ফলে সরস্বতী ও মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া নাগরাজকে বর দিলেন—"যে বয়সে মদালসার মৃত্যু হইয়াছে, ঠিক সেই বয়স লইয়া সে তোমার গৃহে তোমারই কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে।"

দেবতার বরে আবার সাধ্বী মদালসা আপনার অসামান্য সৌন্দর্য লইয়া আসিয়া, যে বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ঠিক সেই বয়স লইয়া নাগরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে নাগরাজ ঋতধ্বজের সহিত মদালসার মিলন ঘটাইয়া দিলেন। প্রেমের জয় হইল। ঋতধ্বজ ও মদালসার অপূর্ব প্রেমবার্তা শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তাঁহাদের এই প্রেমের বিজয়কাহিনী দিকে দিকে বিঘোষিত হইল। ইহাই হইল মদালসার পুরাণকথিত উপন্যাস।

ঋতধ্বজ রাজা ও মদালসার একে একে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দন ও অলর্ক নামে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মদালসা নিজে সন্তানগণের শিক্ষা বিধান করিতেন। তাঁহার উপদেশবাণীসমুদয় রত্নের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে আজিও বিরাজিত রহিয়াছে।

পৌরাণিক যুগে কিরূপ সুন্দর শিক্ষা ও জ্ঞানের সহিত মহিলাদের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইত তাহা প্রণিধানযোগ্য। যখন মদালসা ও ঋতধ্বজের বিবাহ হইল, তখন কুণ্ডলা রাজপুত্রকে সখীর পতিরূপে স্নেহের সহিত বলিয়াছিলেন:—

"পতি পত্নীকে সর্বদা রক্ষা ও ভরণপোষণ করিবে। স্ত্রী পতির সহায় হইলে,

ধর্ম, কর্ম, অর্থ, সকল বিষয়েই সে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রীতির বন্ধনের সহিতই ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটির সম্মিলন হইয়া থাকে। 'বর্দ্ধত্বমনয়া সার্দ্ধং ধনপুত্র সুখায়ুষা।' ধন, পুত্র, আয়ু ও সুখ দ্বারা আপনি ইহার সহিত সুখভোগ করুন।" কুণ্ডলা এইভাবে রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর রাজপুত্র যখন পত্নীর সহিত রাজপুরে প্রবেশ করিয়া পিতামাতার চরণ বন্দনা করিলেন তখন পিতা শক্রজিৎ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"হে পুত্র, তুমি ধন, বল ও সুখ দ্বারা বর্দ্ধিত হও। এই নাগরাজ-তনয়া যেন তোমা হইতে বিযুক্তা না হন।"

পুণ্যবতী সাধ্বী মদালসা প্রতিদিন প্রাতে শ্বশুরশ্বাশুড়ীর চরণবন্দনা করিয়া স্বামীর সহিত দিন কাটাইতেন। মদলসা তাঁহার পুত্রদিগকে সর্বদা সদুপদেশ দিতেন। তিনি শৈশব হইতেই পুত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন নিষ্কাম ধর্মের ও ত্যাগের মন্ত্রে। মদালসা প্রথম তিন পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—"হে বৎস, তুমি শুদ্ধ, তোমার কোনও নাম নাই, কল্পনার সহায্যে তোমার একটি নাম রাখা হইয়াছে মাত্র। তোমার আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ। তোমার দেহ পঞ্চভূতাত্মক। এই দেহ তোমার নহে, তুমিও তাহার নও।"

"পিতা বল, মাতা বল, দয়িতা বল,—পৃথিবীতে আত্মীয় অনাত্মীয় বলিয়া কিছুই নাই। তুমি ইহাদিগকে বহুমাননা করিও না। মূর্খ যে মানুষ সে দুঃখকে উপশমের হেতু এবং ভোগকে সুখের কারণ বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি অবিদ্বান, যে ব্যক্তি মূঢ়, সেই দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।"

মদালসার এইরূপ উপদেশে তাঁহার প্রথম তিনপুত্র বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন একেবারেই স্পৃহাশূন্য হইল। যখন মদালসার চতুর্থপুত্র জন্মিল তখন তিনি তাহার নাম রাখিলেন অলর্ক। এইবার রাজা পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—"যদি আমার প্রিয়কার্য করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তুমি আমার আদেশ পালন কর, এই পুত্রকে প্রবৃত্তির পথে নিয়োজিত কর। হে দেবি! হে সাধ্বি! তাহা হইলে এই পুত্র কখনও রাজধর্ম পরিত্যাগ করিবে না। পিতৃপিণ্ডও লোপ পাইবে না।"

স্বামীর কথায় বিদুষী মদালসা এইবার পুত্রকে রাজধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। মাতা এইবার পুত্রকে রাজার কর্তব্য কি, মন্ত্রীদিগকে কিভাবে উপদেশ দিতে হয় এবং কিরূপে তাঁহাদের কথা

শ্রবণ করিতে হয়, কি প্রকারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলিকে জয় করিতে হয়—এইরূপে রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শত শত হীরকের দ্যুতিকে ম্লান করিয়া, আজিও সেই বিদুষী মহিলার অপূর্ব জ্ঞানজ্যোতিঃর বিভা প্রকাশ করিতেছে।

রাজা ঋতধ্বজ সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করিলে পুত্রস্নেহ-পরায়ণা ও কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্না জননী মদালসা একটি অঙ্গুরীয়কের ভিতরে কয়েকটি উপদেশ লিখিয়া পুত্র অলর্কের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"বৎস! যখন রাজ্য শাসন করিতে করিতে কোনও দুঃখ বা বিপদে পড়িবে সেই সময় অঙ্গুরীয়কের ভিতরে যে উপদেশ কয়টি লিখিত আছে তাহা পাঠ করিলেই সান্ত্বনা লাভ করিবে।" এইরূপ বলিয়া পুত্রকে আশীর্বাদপূর্বক স্বামী ও স্ত্রী বনে গমন করিলেন।

পিতা ও মাতা বনে গমন করিবার কিছুকাল পরে কাশীর রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নগর অবরুদ্ধ হইল। মিত্রেরাও শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কাশী-নরপতি ভেদ ও সামনীতির দ্বারা দুর্গপাল প্রভৃতিকে করায়ত্ত করিলেন। রাজা অলর্ক নগরবাসীর দুঃখদুর্দশায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। রাজকোষে অর্থ নাই, শস্যভাণ্ডারে শস্য নাই, নগরের শত শত নরনারী অন্নাভাবে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে। কোথায় শান্তি? কোথায় শান্তি? এইরূপ বিপদে পড়িয়া রাজা অলর্কের তাঁহার মাতার কথা মনে পড়িল। অমনি অঙ্গুরীয়কটি খুলিয়া মাতার উপদেশ কয়টি পড়িবামাত্র তাঁহার প্রাণে নবোৎসাহের সঞ্জীবনধারা উৎসারিত হইল, তিনি নবজীবন লাভ করিলেন। অঙ্গুরীয়কে লিখিত ছিল।

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহি ভেষজম্॥
কামঃ সর্বাত্মনা হেয়ো জ্ঞাতুঞ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ।
মুমুক্ষাং প্রতি তৎ কার্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্॥

অর্থাৎ, সংসারে আসক্ত মানবগণের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। সাধুসঙ্গ করাই হইতেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সাংসারিক কামনার বশবর্ত্তী হওয়া একেবারেই শ্রেয়ঃ নহে। মুক্তিপথের অভিলাষী হওয়াই মানব মাত্রের বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগের মদালসার এই সকল উপদেশবাণী চিরন্তন সত্যরূপে পৃথিবীর বুকে বিরাজিত থাকিবে।

আত্রেয়ী

আত্রেয়ী প্রাচীন যুগের একজন বিদুষী মহিলা। মহর্ষি বাল্মীকি ছিলেন ইঁহার গুরু। বাল্মীকির নিকট ইনি বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ বাস করিতেন। দণ্ডকারণ্যের বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা সেই সময়ে ভারতবিখ্যাত ছিল। নীলগিরির দূরবর্ত্তী মনোরম শোভা, রমণীয় নদীসমূহের অবিরাম কলগীতি, নদীতটবিহারী সারস ও চক্রবাক, জলচর বিহঙ্গগণে বিরাজিত পদ্মসমন্বিত শান্ত সরোবর, সেকালে দণ্ডকারণ্যকে জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ নিকেতনে পরিণত করিয়াছিল। এইজন্যই বেদজ্ঞ ঋষিগণ মনবিমোহনকারী দণ্ডকারণ্যে তপোবন নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন।

অগস্ত্য মুনির আশ্রম এই দণ্ডকারণ্যেই অবস্থিত ছিল। সেই আশ্রম ছিল বিবিধ পুষ্পফলসমন্বিত, নানাবিধ বিহঙ্গশব্দে প্রতিধ্বনিত এবং পিপ্‌পলী বৃক্ষসমূহে শোভিত রমণীয় স্থলবহুল বনমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই আশ্রমের চারিদিকে ছিল অনেক নির্মল সরোবর, সেই সরোবরসমূহে হংসযূথ ও কারণ্ডবগণ এবং চক্রবাক্‌সমূহ ক্রীড়া করিত। অগস্ত্যের এইরূপ পুণ্য আশ্রমে আত্রেয়ী দেবী অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদের মুখে সামবেদের গাথা শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ঐ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিতে পাই—বনদেবী বাসন্তী আত্রেয়ীকে অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"দেবি! আত্রেয়ি, আপনি কিজন্য এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিয়াছেন? আপনার এতদূর পরিশ্রম করিয়া এখানে আসিবার কারণ কি বলুন ত?"

আত্রেয়ী উত্তরে কহিলেন—"আমি শুনিয়াছি মহর্ষি অগস্ত্য প্রভৃতি পুণ্যতপা ঋষিগণের এই দণ্ডকারণ্য আশ্রমে সামবেদ গীত হয়, আমি সামবেদের সেই সুমধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিবার জন্য এবং বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম হইতে এখানে আসিয়াছি।"

তখন বাসন্তী বলিলেন—"আপনার কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। যে মহাপুরুষ বাল্মীকির নিকট শত শত ঋষিব্রহ্মচারিগণ গমন করিয়া বেদ, উপনিষদাদি

অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, আপনি সে পুণ্য-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে।"

আত্রেয়ী বলিলেন—"কে একজন মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি এই পুত্র দুইটিকে শিক্ষাদান করিতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত। আর সেই পুত্র দুইটি এত বড় মেধাবী যে উহাদের সহিত একসঙ্গে অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদ অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে, এই জন্যই আমি মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে অধ্যয়নের জন্য আগমন করিয়াছি।"

আত্রেয়ী যে কিরূপ জ্ঞানানুরাগিনী ছিলেন ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়। কোথায় আর্যাবর্ত্তে বাল্মীকির আশ্রম, আর কোথায় কোন্ দূর দাক্ষিণাত্যে মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবন! এই দূরদেশ অতিক্রম করা সুদূর অতীতে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের স্পৃহা আত্রেয়ীর এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি ভীষণ বন্যজন্তুসমাকীর্ণ দুর্গম দুস্তর অরণ্যানী, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী, দুর্গম গিরিপথ ও দুরতিক্রম্য নদনদী উত্তীর্ণ হইয়া দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি অগস্ত্য আত্রেয়ীর বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানানুশীলনস্পৃহা দেখিয়া এতদূর পুলকিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে কন্যার ন্যায় পরম স্নেহে নানাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

সে কালের ছাত্রীসমাজের মধ্যে যে বিদ্যানুরাগ ছিল, তাঁহারা বিদ্যালাভের জন্য যে নির্ভীকভাবে দূরদূরান্তরে গমন করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না, আত্রেয়ীর বাল্মীকির তপোবন হইতে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে আগমনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

সুলভা

বিদুষী সুলভা রাজকন্যা হইয়াও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার জনক রাজার সভায় মহামান্য মহাতপা ঋষিগণ উপস্থিত আছেন, এইরূপ সময়ে সুলভা জনকরাজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনকরাজা একজন অপরিচিত ব্রহ্মচারিণীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুলভা বলিলেন—"আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার ব্রহ্মচর্যব্রত পরিসমাপ্ত হইলে গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণাভিলাষিণী হইয়া বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার যোগ্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিবিধগুণবিভূষিত পাত্র মিলিল না বলিয়া আর বিবাহ করি নাই। আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া একাকিনী ঋষিধর্ম পালন করিয়া আসিতেছি।"

মহারাজ জনকের সভা ছিল জ্ঞানী ও মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির আদর্শ স্থান। সেখানে বড় বড় ঋষিতাপসেরা শাস্ত্রজ্ঞানালোচনা করিতে আসিতেন। কাজেই যে তেজস্বিনী নারী সাহস করিয়া আসিয়া জনকের সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের বল, জ্ঞানগরিমা ও প্রতিষ্ঠা যে বিশেষ ভাবেই ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মহারাজ জনককে সুলভা মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া প্রীত করিতে পারিয়াছিলেন।

সুলভার নারীত্বের গর্বও প্রশংসনীয়। উপযুক্ত পাত্র না পাইলে বিবাহ করিব না, এইরূপ পণ কবিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করায় যে কত বড় মনেব বলের প্রয়োজন, সুলভার চরিত্র হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

শবরী

সীতাহারা রামচন্দ্র যখন বিরহব্যাকুল হৃদয়ে লক্ষ্মণের সহিত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন পম্পা সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একদিন শবরীর মনোরম আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। শবরীর আশ্রমটি ছিল অতি রমণীয়। তরুলতাসমাকীর্ণ আশ্রমটি দেখিতে পাইয়া তাঁহারা দুইজনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শবরী সিদ্ধাশবরী নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন মানবের কল্যাণ-দায়িনী স্নেহময়ী মূর্তি। পুরুষ তাপসদের ন্যায় তিনি বল্কল পরিধান করিতেন। কটিদেশ মুঞ্জনির্মিত কটিবন্ধে আবদ্ধ থাকিত। কঠোর তপস্যা করিবার ফলে তাঁহার শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শবরীর চরিত্রও ছিল অতি নির্মল ও পবিত্র। অতিথিসেবাকে তিনি শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

রাম ও লক্ষ্মণ যখন তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তপঃসিদ্ধ

শবরী রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শনপূর্বক উত্থিতা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া পাদ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি অতিথিদের সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিলেন। শ্রীরাম-চন্দ্র শবরীকে দেখিয়া এবং তাঁহার আতিথেয়তায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া শবরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হে তপোধনে! তুমি সকল বিঘ্ন নিবারণ করিয়াছ ত? তোমার তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ত? তুমি শোক ও আহার সংযম করিয়াছ ত? বিহিত নিয়মসকল তোমার দ্বারা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় ত? তোমার চিত্ত নিয়ত প্রসন্ন থাকে ত? হে চারুভাষিণি! তোমার গুরুশুশ্রূষা ফলবতী হইয়াছে ত?"

শবরী রামের এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! অদ্য যখন আপনি আমার দর্শনপথের পথিক হইলেন এবং আমার সেবা গ্রহণ করিলেন, তখন অবশ্যই আমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। হে প্রাণাভিরাম রাম! অদ্য আমার জন্ম, গুরুসেবা ও তপস্যাচরণ সফল হইল। অদ্যই আমি স্বর্গলাভের অধিকারিণী হইলাম। আপনার শুভদৃষ্টি, আপনার স্নেহ ও প্রীতির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছি; এক্ষণে নিশ্চয়ই আমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিব। আপনি যখন চিত্রকূট পর্বতে বাস করিতে-ছিলেন তখন আমি যাঁহাদের সেবা করিতাম, তাঁহারা সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। স্বর্গে যাইবার সময় সেই ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা আমাকে বলিয়াছিলেন—'রাম, লক্ষ্মণের সহিত তোমার এই পুণ্যআশ্রমে আগমন করিবেন; তুমি সেই দুই প্রিয় অতিথিকে সমাদর সহকারে পূজা করিও। তুমি রামকে দর্শন করিয়া অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় লাভ করিবে।'

"হে প্রভু আমার! আমি আপনার জন্য পম্পাতীরজাত বিবিধ সুখাদ্য বন্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।"

শ্রীরামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"আমি সেই মহাত্মাদের ও তোমার প্রভাব শ্রবণ করিয়াছি, আমি সেই সকল প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা করি। যদি তোমার অভিমত হয় প্রদর্শন কর।"

শবরী রামের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের দুইজনকে সেই বৃহৎ বন পরিদর্শন করিতে বলিলেন। কহিলেন—"হে রঘুনন্দন রাম! এই বিখ্যাত বন দর্শন করুন। এই বন 'মাতঙ্গ বন' নামে পরিচিত। এই বনে আমার গুরুগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন। এইস্থানে যজ্ঞ করিবার জন্য বেদমন্ত্রানুসারে হবন করিতেন। এই বেদীর নাম প্রত্যক্স্থলী 'আমার গুরুগণের এই বেদী তাঁহাদের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি প্রভাবিত। একবার তাঁহারা উপবাসে কাতর হইয়াছিলেন, শ্রম করিবার

ক্ষমতা ছিল না; তখন তাঁহারা চিন্তা করিবামাত্র ঐ স্থানে সপ্তসাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই যে তরুশ্রেণী,—স্নান শেষে তাপসেরা ইহাদের শাখায় উপর বল্কল শুষ্ক করিতে দিতেন। তাঁহারা দেবগণের উদ্দেশ্যে নীলপদ্ম, অন্যান্য পুষ্প ও যে যে দ্রব্য দান করিতেন এখনও সেগুলি মলিন হয় নাই। যাহা যাহা আপনাদিগকে বলিবার সেই সমুদয় কথাই বলিলাম। এইবার আমাকে শরীর পরিত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করুন। আমি এতদিনে যাঁহাদের পরিচারিকা-রূপে ছিলাম, এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদিগের নিকট যাইতে বাসনা করিতেছি।"

রাম ভক্তিপরায়ণা শবরীর মুখে এ সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে কহিলেন—"আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। হে ভদ্রে! আমি তোমার সেবায় সম্যকরূপে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, আমি তোমাকর্তৃক সম্যকরূপে অর্চিত হইয়াছি; তুমি তোমার অভিলষিত প্রদেশে গমন করিতে পার।"

চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিহিতা জটাধারিণী শবরী রাম-কর্তৃক শরীর মোচনের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিমধ্যে স্বীয় দেহ হবন করিয়া অনুলেপন ও মাল্যধারিণী, দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, দিব্যাভরণবিভূষিতা, প্রজ্জলিত অনলের ন্যায় দীপ্তিসমন্বিতা ও প্রিয়দর্শনা হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় সেই প্রদেশ উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

শবরী তাঁহার গুরু ঋষিতাপসদের নিকট হইতে বেদ-উপনিষদাদি সম্বন্ধে দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য তাঁহার দীর্ঘকালের প্রতীক্ষা অপূর্ব প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে শবরীর বিষয়ে একটু আলোচনা করিবার আছে। মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে শবরী বাস করিতেন। শবরীর যে পরিচয় আমরা রামায়ণ হইতে পাই তাহাতে জানিতে পারি যে, শবরী নীচজাতীয়া ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের কোনও অনার্যজাতিসম্ভূতা ছিলেন, যেমন ছিলেন গুহকচণ্ডাল প্রভৃতি। কিন্তু এই শবরী সেই যুগের মহাতপা মহর্ষি-গণের নিকট অনার্য বলিয়া উপেক্ষিতা হন নাই, বরং তাঁহাকে তাঁহারা শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। ঋষিদের শিক্ষাদানগুণেই শবরী বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোম করিতে পারিতেন, ব্রাহ্মণগণের সহিত দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, যোগাভ্যাস-নিরতা ছিলেন। অন্ত্যজজাতি হইয়াও তিনি শিক্ষাদীক্ষাদ্বারা আপনাকে গৌরবান্বিতা করিয়াছিলেন। শবরী মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে তপশ্চর্যা করিয়া সিদ্ধা

শবরী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। মতঙ্গ ঋষি যখন দেহত্যাগ করেন তখন তিনি শবরীকে বলিয়া গিয়াছিলেন—

আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্।

রামচন্দ্র একদিন তোমার এই সুপুণ্য আশ্রমে আগমন করিবেন।

সেদিন হইতে শবরী তাঁহার গুরু, তাঁহার শিক্ষক, মতঙ্গ ঋষির বাক্যটিকে চিরন্তন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। রাম কখন আসিবেন শবরী তাহা জানেন না—তাহার দিন, তারিখ, সময়, ক্ষণ, কিছুই নির্দিষ্ট নাই। তবে তিনি আসিবেন—রামচন্দ্র একদিন এক শুভমুহূর্তে আসিবেন। সে কবে কোন্ শুভ বসন্তের প্রীতিজাগরণে, কোকিলকূজনের মধ্য দিয়া আসিবেন, কবে কোন্ সন্ধ্যায় যেদিন সরোবরে নীলপদ্ম ফুটিয়া থাকিবে, মল্লিকা যুথিকার মধুর সৌরভে চারিদিক সুরভিত হইবে—সে দিন কবে কে জানে? তাই তিনি যৌবনের প্রীতি, আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার প্রাঙ্গণতল পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। চন্দন লেপিয়া গৃহদ্বার সুরভিত করিতেন। মৃগচর্মখানি সুগন্ধি ফুলে সাজাইয়া রাখিতেন। কিন্তু সে কোথায়! সে কোথায়!

যৌবনের প্রদীপ্ত তেজ, দেহের শক্তি ও মনের বল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। প্রৌঢ়বয়সও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। শবরীর দেহ অশক্ত হইয়া উঠিল। তবু তিনি আশার মোহে আচ্ছন্ন, তাঁহার প্রাণারাম রামচন্দ্র যে আসিবেনই, কেননা মতঙ্গ ঋষি বলিয়া গিয়াছেন—

আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্।

সাধুবাক্য কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য ত্যাগবার্তা তখন দেশে দেশে সুপ্রচারিত। যিনি পতিতা পাষাণী অহল্যাকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাঁহার স্পর্শে জটায়ুপক্ষীর স্বর্গলাভ হইয়াছিল, সেই রামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমকুটীরে আসিবেন। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা?

তারপর এক শুভদিনে শুভমুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্র শবরীর তপোবনে আসিলেন। এতদিন যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যে যাঁহার প্রতীক্ষা করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র আজ বিরহিণী শবরীর পুণ্য-আশ্রমে পদার্পণ করিয়া তাহা পুণ্যতর করিলেন, তখন শবরী আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্ তব সন্দর্শনান্ ময়া।
অদ্য মে সফলং জন্ম, গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ॥

তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়ান্ লোকাংস্ ত্বৎ প্রসাদাদ্ অরিন্দম ॥

আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, কেননা আজ যে, প্রভু, আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। আজ আমার জন্ম সফল, আমার গুরুপূজা সার্থক হইয়াছে। হে প্রাণারাম রামচন্দ্র, আজ তোমার চক্ষু আমার উপর পতিত হইয়াছে। হে শত্রুজয়ী, আজ আমি তোমার প্রসাদে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়াছি।

তারপর—"ওগো, আরাধ্যদেবতা! আমার দান গ্রহণ কর। আমি তোমাব জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি সে দান লইয়া আমাকে কৃতার্থম্মন্য কর—

ময়াতু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ।
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্ তীরসম্ভবম্ ॥

"হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আমি আপনার জন্য পম্পাতীরজাত বিবিধ সুখাদ্য বন্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন!"

শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধাশবরীর এইরূপ ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনে বিমোহিত হইলেন, প্রশংসিতকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

অর্চিতোহহং ত্বয়া ভদ্রে, গচ্ছকামং যথা সুখম্

হে ভদ্রে, আমি তোমার অর্চনা গ্রহণ করিলাম। তোমার পরলোকযাত্রা যেন সুখকর হয়। তুমি অভিলষিত পথ গ্রহণ কর।

অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া শবরী তাহাতে আরোহণ করিলেন।

ধীরে ধীরে শবরীর শেষনিঃশ্বাস আকাশে বাতাসে মিলাইয়া গেল।

শবরীর এই প্রতীক্ষার করুণ কাহিনী আমাদের চিত্তকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করে। তাঁহার রামচন্দ্রের দর্শনপিপাসার এই ইতিহাসটুকু বিরহিণী চিত্তের চিরন্তন যৌবনশ্রীকে সঞ্জীবিত করিয়া ত্যাগের মহিমায় সার্থক করিয়া দিয়াছে।

বৌদ্ধ যুগ

সুজাতা (১)

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধযুগ নানাদিক দিয়াই আমাদের দেশকে বাহ্যসম্পদ ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানগরিমায় সর্বতোভাবে গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। বুদ্ধদেব অহিংসার যে পবিত্র ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এককালে পৃথিবীর বহু দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বুদ্ধদেব জীবিতকালে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোভাবের পর শিষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া সে সমুদয় উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কালক্রমে উহা হইতেই বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি গঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের জীবনকথা সর্বজনপরিচিত হইলেও, আমরা প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তাহার উল্লেখ করিব। প্রায় আড়াই হাজার বৎসরেরও পূর্বে, বর্তমান কাশীর প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলে এবং বর্তমান যুক্তপ্রদেশস্থ বস্তি জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কপিলবাস্তু নগর অবস্থিত ছিল। কপিলবাস্তু নগরে শাক্যগণের রাজধানী ছিল। শুদ্ধোদন এই শাক্যজাতির একজন প্রসিদ্ধ নায়ক ছিলেন। ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। কপিলবাস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী নামক উদ্যানে রাজা শুদ্ধোদনের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাজা তাঁহার নাম রাখিলেন গৌতম। আবার শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই কুমার শাক্যমুনি নামেও খ্যাত হইলেন। গৌতমের মাতার নাম ছিল মায়াদেবী। জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন।

গৌতম বড় হইয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? গৌতমের কাছে এ সব কিছুই ভাল লাগিত না। শিশুকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে বৈরাগ্যভাব দেখা গেল। রাজা পুত্রকে বৈরাগ্যের দিক হইতে ফিরাইয়া, সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ষোড়শ বর্ষ বয়সে শাক্যদণ্ডপাণি নামে একজন ছোট রাজার (কাহারও কাহারও মতে সুপ্রবুদ্ধের) কন্যা যশোধরার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন।

একদিন গৌতম ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার সারথি ছন্দক। পথে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্য জন্মিল। অবশেষে দেখিলেন একজন সন্ন্যাসী ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার প্রাণে কোনরূপ অশান্তির চিহ্ন নাই। এ সব দৃশ্য দেখিয়া গৌতমের মন কেমন হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এমন কি কিছুই নাই যাহাতে এ সব জ্বালাযন্ত্রণা ও রোগশোকের হাত হইতে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে?

গৌতম স্থির করিলেন যে, তিনি সত্যের সন্ধানে বাহির হইবেন। তারপর একদিন রাত্রিকালে যখন সমুদয় পৃথিবী নিস্তব্ধ, পত্নী নিদ্রিতা, নগরের কেহই জাগরিত নাই, তখন বিশ্বস্ত সারথি ছন্দককে সঙ্গে লইয়া রাজ্য, ধন, মান, সমুদয় ত্যাগ করিয়া জগতের নরনারীর দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্য গৌতম গৃহত্যাগ করিলেন। তখন যশোধরা ফুলের মত সুকোমল সুন্দর শিশুটিকে বুকে করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। গৌতম একবার ভাবিলেন, তাঁহাকে বলিয়া যান, কিন্তু পাছে পত্নীর কাতর অনুরোধে, পুত্রের স্নেহে, সঙ্কল্পে বাধা পড়ে, তাই ধীরে নীরবে চলিয়া গেলেন।

ভোরের বেলা রাজ্য ছাড়িয়া বহু দূরে একটি বাগানে আসিয়া একে একে তাঁহার সমস্ত সুন্দর রাজবেশ ছন্দককে দিয়া, নিজে সামান্য একখানি ছিন্নবস্ত্র পরিয়া ভিখারী সাজিলেন।

ভিখারী সিদ্ধার্থ প্রথমে বৈশালী নামক নগরে আসিলেন। সে সময়ে বৈশালী নগরে অনেক বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি তাঁহাদের কাছে শাস্ত্র পড়িলেন, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইল না।

তারপর সিদ্ধার্থ গয়ার নিকটবর্তী এক নির্জন স্থানে গিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শরীরকে যতদূর কষ্ট দিতে হয়, তাহা দিলেন। অস্থিচর্ম সার হইল, কিন্তু তবু তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল না। এ সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শরীরকে কষ্ট দিয়া কোন পুণ্যলাভ হয় না। শরীরকে কষ্ট দেওয়া বৃথা, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অতিকষ্টে সেই বন ত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে গিয়া বসিলেন।

সে সময়ে ঐ স্থানের নাম ছিল উরুবিল্ব (কাহারও মতে সেনানী)। আজকাল উহার নাম বুদ্ধগয়া। তখন ঐ স্থানটি বড় সুন্দর ছিল; চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, সবুজ শস্যে ভরা মাঠ। গ্রামের পাশ দিয়া নৈরঞ্জনা নদী কুলকুল

রবে বহিয়া চলিয়াছে। সিদ্ধার্থ স্নান করিয়া সবে অশ্বত্থতলায় বসিয়াছেন, এমন সময় একজন ধনী ব্যক্তির পত্নী সুজাতা তাঁহার সম্মুখে এক বাটি পায়সান্ন উপস্থিত করিলেন।

আমরা এইখানে সুজাতার কথাই বলিতে যাইতেছি। বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রথম অবস্থায় তাহাতে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি বুদ্ধদেব নিজে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে সুজাতার পায়সান্ন দান তাঁহাকে নব-জীবন দান করিয়া ধর্মসাধনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল। কাজেই বুদ্ধদেবের সাধনার মূলেও নারীর সুকোমল মঙ্গলহস্ত বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব যখন ছয়বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, তখন এই মহীয়সী মহিলার অন্নদানেই তাঁহাকে সজীব করিয়াছিল। সুজাতা সেনানী নামক গ্রামের ভূম্যধিকারীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায় তিনি বনদেবতার নিকট মানত করিয়াছিলেন যে, পুত্র লাভ হইলে নিজহস্তে পায়সান্ন দ্বারা বনদেবতার পূজা দিবেন। যথাসময়ে সুজাতার একটি পুত্রসন্তান হইল। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবার তিন মাস পর সুজাতা বনদেবতার পূজা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। নিকটবর্তী অরণ্যে যে বৃক্ষে বনদেবতা বাস করিতেন বলিয়া লোকে মনে করিত, সুজাতা তাহার সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিতে এবং তাহার চারিদিক লোহিত বর্ণের সুত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে রাধা নামে একজন পরিচারিকাকে প্রেরণ করিলেন। সে সময়ে সিদ্ধার্থ উরুবিল্বের বনে তপস্যা করিতে-ছিলেন। রাধা তাঁহাকেই বনদেবতা মনে করিয়া সুজাতার নিকট আসিয়া বলিল যে, বনদেবতা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তরুতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সুজাতা বনস্পতি সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধদেবকে বনদেবতা মনে করিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। তখন বুদ্ধদেব সুজাতাকে বলিলেন, 'বৎসে, কি আনিয়াছ?' সুজাতা কহিলেন—"ভগবন্, সদ্যঃপ্রসূত শত গাভীদুগ্ধে পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশটি, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারটি গাভী হৃষ্ট; এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ভাল ভাল ছয়টি গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ সুগন্ধি মসলায় উৎকৃষ্ট তণ্ডুল সহযোগে পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে এই অন্নদানে দেবার্চনা করিব। প্রভো! এখন সেই পায়সান্ন লইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর।"

বুদ্ধ সুজাতাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—"তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সমর্থ হই।" এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া সেই স্থান হইতে বোধিবৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন; সেই ধ্যানে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সুজাতা [বুদ্ধের প্রতি-] র এই ঘটনাটি অবলম্বনে একটি অতি সুন্দর কবিতা আছে; আমরা এখানে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম। বুদ্ধদেবকে বনদেবতা ভ্রমে সুজাতা পায়সান্ন দিতে যাইয়া বলিতেছেন,—

কে তুমি হেথা বিজনে বসি ?
নর, কি ঋষি, দেবতা ?
অঙ্গ ছাপি পুণ্যপ্রভা চমকে !
দীপ্ত তব বদন নব,
তপ্ত যেন সবিতা,
নিরখি নর-নয়ন সদা ঝলকে।

ক্লান্ত নহে কান্ত তনু
করি কঠোর সাধনা;
নহ ত প্রভু তাপস তবে নহ গো।
সুপ্তিহীন নয়নে ঝরে
দীপ্তি মাখা করুণা;
ধেয়ান রত ঋষি ত তুমি নহ গো।

দেবতা তুমি জগৎভূমে
এসেছ প্রভু এসেছ,
ফুটাতে প্রীতি কঠোর হৃদিশিলাতে।
হরিতে পাপ বাসনা-তাপ
এসেছ প্রভু এসেছ,
মরণ নাশি অমৃতরাশি বিলাতে।

জগৎ যবে শরণ লবে
চরণে তব কাঁদিয়া,
পিপাসা ক্ষুধা মিটাতে সুধা ঢালিয়া,

বিশ্বপাতা অন্নদাতা।
পূজিব তবে কি দিয়া ?
লবে কি এহি অন্ন কৃপা করিয়া ?*

বুদ্ধদেবের তপঃসিদ্ধির মূলে এই মহীয়সী মহিলার এই পায়সান্ন দান যে কত বড় ফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। প্রাচীন ভারতের এই মহিলার সুন্দর ছবিটি আমাদের চিত্তকে আনন্দে অভিষিক্ত করে, রমণীর স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়।

* স্বর্গত বিজয়চন্দ্র মজুমদার
বৌদ্ধধর্ম— ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
Light of Asia—Arnold

মহাপ্রজাপতী

বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রথম সংগঠনকালে স্ত্রীলোকদিগের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব মানবের দুর্বলতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই সঙ্ঘগণ্ডীর ভিতরে রমণীর প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যদি নারীজাতিকে ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার পরিণাম শুভ হইবে না।

আনন্দ বুদ্ধদেবের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন। ইনি ও বুদ্ধ একই দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দ বুদ্ধদেবের প্রতি একান্ত স্নেহশীল ও অনুরাগী ছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণ পর্যন্ত আনন্দ সদাসর্বদা বুদ্ধের সঙ্গে থাকিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। তিনি সর্বদা একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের উপদেশসমূহ শ্রবণ করিতেন এবং অতি মধুরভাবে অপরকে বুদ্ধদেবের সেই সকল উপদেশের গভীর তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেন।

মহামায়া বুদ্ধদেবের জননী। মহাপ্রজাপতী মহামায়ার সহোদরা এবং সপত্নী। মহামায়ার মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতী বুদ্ধদেবকে শৈশবকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর ইনি বুদ্ধদেবকে বলিলেন—"আমি বিধবা হইয়াছি, আমাকে এক্ষণে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" বুদ্ধদেব ইহাতে অস্বীকৃত

হইলেন। মহাপ্রজাপতী ইহাতে নিরস্তা হইলেন না। তিনি শাক্যবংশীয়া আরও অনেক মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পদব্রজে বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন। যে সকল মহিলা কোনদিন রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হন নাই, আজ তাঁহারাই ধর্মের জন্য যোজনের পর যোজন পথ পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তবু তাঁহারা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। ইহা দেখিয়া আনন্দের চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি বুদ্ধদেবের নিকট মহিলাদিগকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি স্ত্রীলোকেরা গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনী না হয় তাহা হইলে আমার প্রবর্তিত ধর্ম সহস্র বৎসরকাল জীবিত থাকিবে। আজ তাঁহাদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধর্মের পবিত্রতা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, অল্প কালের মধ্যে সত্যধর্ম লোপ পাইবে।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং মহাপ্রজাপতী দেবীকে তাঁহার প্রথম শিষ্যারূপে গ্রহণ করিলেন।

এ সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত আনন্দের কথোপকথনটি প্রণিধানযোগ্য। আনন্দ মহিলাদিগকে সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করিবার পক্ষে অনুরোধ করিতে গিয়া বুদ্ধদেবকে বলিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোক সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলে কি তাহার ফললাভ হয় না? তাহারা কি আর্যমার্গ অনুসরণ করিয়া অর্হৎ হইবার অধিকাবিণী নহে?"

বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—"তাহারা অধিকারিণী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"তবে কেন মহাপ্রজাপতীকে সঙ্ঘভুক্তা করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন? তিনি আপনার মাতৃবিয়োগের পর স্বীয় স্তনদুগ্ধ দিয়া আপনাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার বিশেষ ভক্ত, পবম উপকারিণী সেবিকা, তাঁহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কর্তব্য :নহে।" আনন্দের এইরূপ যুক্তি ও তর্কের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে বুদ্ধদেব মহাপ্রজাপতীকে সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সে সকল নিয়ম কতকটা মনুর বিধানের মত। সেই বিধানসমূহ অষ্টানুশাসন নামে অভিহিত।

মহাপ্রজাপতী এই ধর্মানুশাসন মানিয়া লইয়া বুদ্ধের প্রথমা শিষ্যারূপে পরিগৃহীতা হইয়াছিলেন। পরে এক সময়ে মহাপ্রজাপতী ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী গুণ ও কর্মানুসারে সমান মানমর্যাদার অধিকারী হইতে পারে সেইরূপ প্রস্তাব করেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহা স্বীকার করেন নাই।

আদর্শ সন্ন্যাসিনীর কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করা কর্তব্য তাহা মহাপ্রজাপতীর প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ হইতে জানা যায়। তৃষ্ণা পরিহার, অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা, বৃথা আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জনে ধ্যানধারণা করা, ধর্ম পালন করা, আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীলা হওয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা, বিনয়ী ও নম্র হওয়া, সকলের সহিত সদ্ভাবে সন্তোষের সহিত জীবন যাপন করা, প্রত্যেক বৌদ্ধতপস্বিনীরই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বুদ্ধদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুদের তুলনায় ভিক্ষুণীদের সংখ্যা কম হইলেও, বৌদ্ধতাপসীগণ জনসমাজে বিশেষ সম্মানিতা ছিলেন। তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গতিবিধি, তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়, আমরা নানা ভাবে জানিতে পারি। বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকাগণ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও পুণ্যবলে শ্রমণ পদে আরূঢ়া হইতে পারিতেন; এমন কি অর্হতী হইবার অধিকারিণীও হইতেন। অনেক বৌদ্ধ তাপসীর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য এবং কবি-প্রতিভা বৌদ্ধসমাজে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

যশোধরা

পুণ্যবতী যশোধরা বুদ্ধদেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহার পাতিব্রত্য, নিষ্ঠা এবং ত্যাগের মহিমা বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের পক্ষে মহা সুযোগ দান করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের নামের সহিত যশোধরার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

যশোধরা কেলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা। যশোধরার সৌন্দর্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের কথা সে সময়ে সর্বত্র সুপ্রচারিত ছিল। রাজা শুদ্ধোদন যশোধরার রূপ ও গুণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সুপ্রবুদ্ধ প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কেন না সিদ্ধার্থ সংসার-ত্যাগী প্রব্রাজক হইবেন এইরূপ দৈববাণী প্রচারিত ছিল এবং সে কথা অনেকেই জানিতেন। এজন্যই যশোধরার সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সুপ্রবুদ্ধ অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যশোধরা পিতার এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়া দৃঢ়তার সহিত পিতাকে বলিয়াছিলেন—"সিদ্ধার্থ প্রব্রাজক হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।"

কেলিরাজ সুপ্রবুদ্ধ ছিলেন শুদ্ধোদনের সামন্ত নৃপতি, কাজেই শুদ্ধোদন নিজে যখন অগ্রণী হইয়া কেলিতে গমন করিয়া যশোধরাকে সিদ্ধার্থের সহিত বিবাহ প্রদানের জন্য গ্রহণ করিলেন তখন সুপ্রবুদ্ধ আর তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে সেকালের বিবাহের রীতি অনুযায়ী যশোধরার জন্য পাঁচশত রাজকন্যার প্রয়োজন হইল, তখন শাক্যনৃপতিরা বলিলেন—"সিদ্ধার্থ বালক, তাহার কিরূপ বিদ্যালাভ হইয়াছে, সে বিষয়ে আমরা কোন পরিচয় পাই নাই, তারপর তিনি নিজের পরিবার রক্ষা করিবার মত শক্তিশালী কি না তাহাও জানি না। সিদ্ধার্থ এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিজের বাহুবলের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং সমুদয় শাক্যরাজ-পুত্রদিগকে তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষার নিমিত্ত প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে দেবদত্ত প্রভৃতি শত শত শাক্য রাজপুত্রের সহিত সিদ্ধার্থ প্রতি-যোগিতা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অস্ত্রনৈপুণ্য, বলবীর্য, এবং সর্বশাস্ত্রপারদর্শিতার নিকট সকলেই পরাজয় স্বীকার করিলেন। অতঃপর আর সিদ্ধার্থের বিদ্যাবত্তা ও অস্ত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে কোন কথাই হইল না। শুভদিনে বিশেষ উৎসব আনন্দের সহিত যশোধরার সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে সিদ্ধার্থ যখন গভীর রাত্রে সংসারত্যাগ করিলেন, নিদ্রিতা যশোধরা তাঁহার মহানিষ্ক্রমণের কথা জানিতেও পারিলেন না!—যখন জানিলেন তখন সাধ্বী সতী যশোধরার মনপ্রাণ ভাঙিয়া গেল। তাহার হৃদয় পতির বিরহ-ক্লেশে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। তাঁহার মনে হইল যেন সমস্ত পৃথিবী শোভাহীন হইয়া পড়িয়াছে, পৃথিবী অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। যশোধরা এই আঘাতের বেদনা নীরবে সহ্য করিলেন, কেননা তাঁহার স্বামী বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি মানবজাতির জরামরণভীতি দূর করিবেন। যশোধরা জগতের কল্যাণমন্ত্রের নিকট আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ, ব্যক্তিগত সুখবিলাসকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিলেন। যে দিন সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলেন, সে দিন হইতে পতিব্রতা যশোধরা প্রোষিতভর্তৃকা-ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। যখন ছন্দকের মুখে শুনিলেন যে, সিদ্ধার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, তখন তিনিও ভ্রমর কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম ছেদন করিয়া মুণ্ডিত মস্তক হইলেন। যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ রাজোচিত বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, তখন যশোধরা একে একে রত্ন-খচিত ভূষণ ও বসন পরিত্যাগ করিয়া চীরধারিণী হইলেন। যখন আরও শুনিলেন যে, সিদ্ধার্থ আর কোন বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করেন না, সিদ্ধার্থ মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার

করেন না, তখন যশোধরা নিজেও ঐ সকল বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন সিদ্ধার্থের ন্যায় তিনিও একাহারী হইলেন। যশোধরা রাজপ্রাসাদে বাস করিয়াও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন এবং মৃৎপাত্র ভিন্ন অন্য কোন ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতেন না। সিদ্ধার্থের মহানিষ্ক্রমণের পর সেকালের রীতি অনুযায়ী অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু সতীসাধ্বী পতিগতপ্রাণা যশোধরা সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা হৃদয়ে স্থান দেন নাই।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিবার পর উরুবেলায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া কতিপয় নূতন শিষ্য লাভ কবিলেন, সেখানে থাকিতে নৃপতি বিম্বিসার বহু সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সে স্থানে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইয়া বেণুবন (বাঁশবন) নামক এক সুরম্য উদ্যান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বুদ্ধদেব কপিলবাস্তু যাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একদিন যে কপিলবাস্তু হইতে গভীর নিশীথে বৈরাগ্যের দীপ্ততেজ হৃদয়ে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, আবার কতকাল পরে সেই প্রিয় জন্মভূমি কপিলবাস্তুতে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী রূপে ফিরিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার মুণ্ডিতকেশ, আজ তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, আজ তাঁহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র। নগরে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধার্থ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন—রাজা শুদ্ধোদন এই কথা শুনিয়া ব্যথিত প্রাণে ছুটিয়া আসিলেন এবং সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখিয়া করুণকণ্ঠে বলিলেন— "কে এই? এই কি আমার বংশের দুলাল শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? কেন বৎস! তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছ?"

তখন বুদ্ধদেব বলিলেন—"মহারাজ, আমি আমার তপঃপ্রভাবে এবং প্রেম-বলে যে অক্ষয় রত্ন লাভ করিয়াছি তাহা, পিতৃদেব, আপনার চরণে সমর্পণ করি ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আপনি আমার সেই দান গ্রহণ করুন।"

শুদ্ধোদন লজ্জিত হইলেন। অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। বুদ্ধদেব পিতার নিকট নির্বাণমুক্তির বাণী কহিয়া সেই অমৃতধারায় তাহার চিত্ত অভিষিক্ত করিলেন। পুত্রের মুখে এই সমুদয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন—তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল।

বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে পর রাজপরিবারস্থ সমুদয় স্ত্রীপুরুষই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত। আসিলেন না কেবল যশোধরা।

বুদ্ধদেব যশোধরার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজান্তঃপুরবাসিনীরা বলিল তিনি আসিবেন না। তখন গৌতম শুদ্ধোদনের সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন—যশোধরা মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়িতকেশে বসিয়া রহিয়াছেন। নয়নসমক্ষে পতিদেবতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল। যে দীর্ঘ সংযম ও সহিষ্ণুতা-দ্বারা আপনার মনকে সংযত রাখিয়াছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ-দেবতা স্বামীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সে সংযম রক্ষা করিতে পারিলেন না। গৌতমের পদযুগল ধারণ করিয়া তিনি অজস্র ধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এতদিন অভাগিনী যশোধরা, দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায় কিরূপ ক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন রাজা শুদ্ধোদন একে একে পুত্রের নিকট সে কথা বলিলেন। যশোধরাও গৌতমের সহিত রাজাকে দেখিতে পাইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বুদ্ধদেব পত্নীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না—প্রশান্ত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা স্নেহময়ী পত্নীকে আনন্দে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। যশোধরার অসাধারণ পতিভক্তি দেখিয়া গৌতমেরও মন গলিয়া গিয়াছিল। যশোধরা পূর্বজন্মেও কিরূপ গুণবতী ছিলেন 'জাতকের' একটি গল্প বলিয়া তিনি সকলকে সেই কথা বুঝাইয়া দিলেন। পরদিন তিনি কপিলবাস্তু ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া যশোধরার মনে এক নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল।

কিছুকাল পরে যশোধরা তাহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের ন্যায় বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাহুল তখন সাত বৎসরের বালক মাত্র। যশোধরা পুত্রকে বলিয়া দিলেন—"ঐ যে সাধুকে দেখিতেছ, ঐ সাধুই তোমার পিতা। এই সাধুর কাছে অনেক ধনরত্ন, অনেক ঐশ্বর্য আছে, তুমি তাহার কাছে যাইয়া পিতৃধন চাহিয়া আন।" রাহুল বলিল, "রাজাই ত আমার পিতা, আমার আবার পিতা কে?" যশোধরা বুদ্ধদেবকে দেখাইয়া দিলেন। রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া তাহাকে পিতৃসম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া বলিল—"পিতা, আমাকে আমার প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি প্রদান করুন।" বুদ্ধ স্নেহের সহিত পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস! পৃথিবীর ধন, রত্ন, টাকা কড়ি, এ সকল কিছুই আমার নাই। আমার কাছে সত্যরত্ন আছে। যদি তুমি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে দিতে পারি। যদি তুমি তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে পার তাহা হইলেই আমি তোমাকে সেই সত্যরত্ন প্রদান

করিব।" এইরূপ বলিয়া বুদ্ধদেব পুত্রকে বিবিধ ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। বালক সেই পিতৃ উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইল।

কালক্রমে শুদ্ধোদন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নন্দ, রাহুল, দেবদত্ত, মহাপ্রজাপতী প্রভৃতি সকলে একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে পতিকুলের ও পিতৃকুলের সমুদয় ধনসম্পত্তিরই অধিকারিণী হইলেন যশোধরা। কিন্তু সংসারের সুখবিলাস, ধনসম্পত্তি তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না, তিনি মহাপ্রজাপতীর ন্যায় ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিবার জন্য মনস্থিব করিলেন। একদিন সহস্র শাক্যরাজকন্যা-পরিবৃতা হইয়া তিনি কপিলবাস্তু পরিত্যাগ করিলেন। কোপি ও কপিলবাস্তু এই তুই জনপদবাসী নরনারী তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মের ও ত্যাগের প্রবল আহ্বানের কাছে সব চেষ্টা পরাজিত হইল। যখন কিছুতেই যশোধরাকে তাঁহারা নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাহার যাতায়াতের জন্য রথ ইত্যাদি দিতে চাহিলেন। তিনি তাহাও লইলেন না।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ যোজন পথ চলিয়া তিনি বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া মহা-প্রজাপতীর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক শ্রাবস্তীতে গিয়া বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন। বুদ্ধদেব যশোধরাকে পরম প্রশান্ত চিত্তে উপসম্পদা দিয়াছিলেন।

ইহার পর যশোধবা অর্হত্ব লাভ করিলেন এবং শ্রাবস্তীতেই কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এইস্থানে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে লোকে তাহাকে বিবিধরূপ উপহার প্রচুর পরিমাণে পাঠাইতে লাগিল, যশোধরা ঐরূপ উপহারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পুনরায় বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেও নানাস্থান হইতে উপহার আসিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি রাজগৃহে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যশোধরা ৭৮ বৎসব বয়সে নির্বাণ লাভ করেন।

যশোধরার পতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও ত্যাগ, এবং নিষ্ঠা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীদের মধ্যে তাহাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছিল।

সীতার পাতিব্রত্যধর্মের ন্যায় যশোধরার ত্যাগ ও সতীত্ব-গৌরব বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষেব ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

সোমা

মহাপ্রজাপতী ও যশোধরা ব্যতীত আরও অনেক বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী জ্ঞান ও ধর্মানুশীলন দ্বারা প্রাচীন ভারতের নারীসমাজের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। সেকালে শ্রাবস্তী নগরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম শেঠমহেঠ; ইহা অযোধ্যাপ্রদেশে গোণ্ডা জেলায় অবস্থিত। সে সময়ে শ্রাবস্তী ছিল উত্তর-কোশল রাজ্যের রাজধানী। কিংবদন্তী এই যে, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত এই নগর স্থাপন করেন। ইহা অচিরবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরবতীর বর্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

শ্রাবস্তীর জেতবন উদ্যান ছিল পরম রমণীয় স্থান। অনাথপিণ্ডদ নামক শ্রাবস্তীবাসী একজন ধনবান বণিক্ ঐ জেতবন উদ্যান ক্রয় করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। জেতবনে বুদ্ধদেবের প্রিয় আশ্রম ছিল। জেতবন হইতে অনেক 'জাতকের' সৃষ্টি হইয়াছিল। জেতবনের বিরাট বিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিখ্যাত চীন পর্যটক ইউ-য়ান-চুয়াঙ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এই সুপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তীনগরীর এক ব্রাহ্মণগৃহে সোমার জন্ম হয়। সোমার পিতা রাজা বিম্বিসারের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সোমাকে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সোমা সেই বয়স হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। সভাপণ্ডিত মহাশয় কন্যার প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। একবার যাহা শুনিতেন সোমা আর তাহা ভুলিতেন না। সোমা মাত্র ষোল বৎসর বয়সে হাজার হাজার বৌদ্ধগাথা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপভাবে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে তাহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিল। সোমা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য শ্রাবস্তীর নিকটস্থ এক উপবনে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি একদিন ধ্যানমগ্না হইলেন।

নিস্তব্ধ নিশীথ। নির্জন উপবন। পল্লবঘন বৃক্ষতলে সোমা ধ্যান-নিরতা; এরূপ সময়ে 'মার' আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। মার সোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

করিয়ে কঠোর তপ যে পদ করেন লাভ যোগীঋষিগণ,
তুমি নারী কেমনে পাইবে সেই দুর্লভ রতন ?
রাঁধবাড় চিরকাল, তবু হায় ! পাকিল না হাত,
টিপিয়া দেখিতে হয় বার বার ফুটিল কি ভাত !

তখন সোমা দৃঢ়ভাবে মারের কথার উত্তর দিলেন :—

নারীজন্ম লভিয়াছি, তাহে কিছু হয় নাই দোষ,
অচল যাহার চিত্ত লভে সে যে অনন্ত সন্তোষ।
সত্যের শিখর লক্ষ্য ;—কোন বাধা, কোন ভয় নাই,
আপনার শক্তি 'পরে করিয়া নির্ভর লক্ষ্যপথে চলে যাই।
অর্হৎ যে পথে চলে সেই পথে হব আগুয়ান,
বিষয়বাসনা তুচ্ছ, লক্ষ্য তার অনন্ত নির্বাণ !
অবিদ্যার অন্ধকার ঘুচাইব সত্যের আলোকে,
চলে যাব সত্য পথে নিজ মনে অপূর্ব পুলকে।
ওরে রে পাপিষ্ঠ মার, বৃথা ভয় দেখাস্ আমারে,
চিনেছি চিনেছি তোরে—দূর হয়ে যারে একেবারে।

এইভাবে মারের প্রলোভন জয় করিয়া সোমা অর্হৎপনা লাভ করেন।

এইরূপভাবে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর সোমা ধর্মচর্চায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

বিশাখা

বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা যে সকল সতীসাধ্বী এবং দানশীলা মহিলার পরিচয় পাই তাঁহাদের মধ্যে বিশাখাকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করা যাইতে পারে।

বিশাখা পিতামাতার দিক্ হইতেও যেমন শ্রেষ্ঠ বংশে এবং অতুল ধনসম্পদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহও সেইরূপ অতি প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীর গৃহে হইয়াছিল।

বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক, পিতা ধনঞ্জয়, সকলেই বিপুল ধনশালী ছিলেন।

অঙ্গদেশের ভদ্রঙ্কর নামক স্থানে তাঁহাদের বাস ছিল। বুদ্ধদেব যখন অঙ্গদেশে প্রথম ধর্মপ্রচার করিতে গমন করেন, সে সময়ে বিশাখা সাত বৎসর বয়স্কা বালিকা মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই বুদ্ধদেবের মধুর উপদেশাবলী তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা প্রেরণা জাগাইয়াছিল, বালিকার কোমল প্রাণে সেবাধর্মের উপকারিতা অনুভূত হইয়াছিল।

সে সময়ে মগধে অনেক ধনী ও প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। কোশলে মগধের ন্যায় ধনী ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠীদের বাস ছিল না। এই জন্য নৃপতি প্রসেনজিৎ রাজা বিম্বিসারকে রাজগৃহ হইতে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীকে তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। মগধের প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠীরা কেহই কোশলে যাইতে সম্মত হইলেন না। ধনঞ্জয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী। বিম্বিসার তাঁহাকেই কোশলরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় কোশলে গমন করিয়া সাকেতপুর নামক নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

সে সময়ে শ্রাবস্তীনগরীতে মৃগার নামক একজন ধনবান্ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। মৃগারের পুত্র পূর্ণবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পঞ্চকল্যাণী কন্যা না পাইলে বিবাহ করিবেন না। "পঞ্চকল্যাণী"র অর্থ এইরূপ—(১) তাহার কেশদাম হইবে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় সুচিক্কণ, (২) তাহার অধরোষ্ঠ হইবে পক্ক বিম্বফলের ন্যায় সুদর্শন, (৩) তাহার দন্তসমূহ হইবে মুক্তাফলের ন্যায় শুভ্র, উজ্জ্বল, ঘনবিন্যস্ত, সমদীর্ঘ, (৪) তাহার দেহের বর্ণ হইবে সর্বত্র একরূপ, (৫) আর বিংশতি সন্তানের জননী হইলেও সে হইবে স্থিরযৌবনা।

মৃগার পুত্রের এইরূপ পণ অনুযায়ী পাত্রীর সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে বিশাখাকে এই সমুদয় গুণবিশিষ্টা দেখিতে পাইয়া তাহার সহিতই পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। এই সময়ে বিশাখার বয়স হইয়াছিল মাত্র পনের বৎসর।

ধনঞ্জয় কন্যার বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। স্বয়ং কোশল-নৃপতি পাত্রমিত্র ইত্যাদি সহ সৈন্যসামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন ; সে সময় বর্ষাকাল ছিল বলিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের অভাব হওয়ায় ধনঞ্জয় চন্দন কাষ্ঠদ্বারা সমবেত অভ্যাগতদিগের খাদ্যদ্রব্যাদি রন্ধন করাইয়া পরিপাটিরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন। বিবাহের সময় ধনঞ্জয় কন্যাকে যে যৌতুক দিয়াছিলেন সে সকলের মধ্যে শিরোভূষণস্বরূপ একটি কৃত্রিম ময়ূর দিয়াছিলেন। বিভিন্ন বর্ণের মণিমুক্তাদ্বারা উহা এমনি সুকৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে উহাকে প্রকৃত ময়ূর

বলিয়া ভ্রম হইত। বায়ু প্রবাহিত হইলে উহার মুখ হইতে কেকারব নির্গত হইত। এইরূপ কল-কৌশল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

ধনঞ্জয় কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশকয়টি প্রহেলিকাময়ী ভাষায় বিবৃত হইয়াছিল, সহজে বুঝিতে পারিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। বিশাখার শ্বশুর মৃগার অন্তরালে থাকিয়া এই উপদেশগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

ধনঞ্জয় কন্যাকে বলিয়াছিলেন—(১) ঘরের আগুন বাহিরে দিও না, অর্থাৎ গৃহের গুপ্তকথা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না। (২) বাহিরের আগুন ঘরে আনিও না, অর্থাৎ ভৃত্যগণ যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে সে সব কথা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট বলিও না। (৩) যে দেয় তাহাকে দান করিও। (৪) যে দেয় না তাহাকে দান করিবে, অর্থাৎ নিঃস্ব আত্মীয় স্বজনকে দান করিবে। (৫) যে দেয় বা দেয় না তাহাকেও দান করিবে; অর্থাৎ দরিদ্রদিগকে দান করিবে। (৬) সুখে উপবেশন করিবে, অর্থাৎ উচ্চাসনে বসিবে না, কারণ গুরুজন উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ করিতে হইবে। (৭) সুখে আহার করিবে—গুরুজন ও ভৃত্যাদির আহারান্তে নিজে নিশ্চিন্তমনে ভোজনে বসিবে। (৮) সুখে শয়ন করিবে, অর্থাৎ গুরুজন নিদ্রিত হইলে নিজে শয়ন করিবে। (৯) অগ্নির পূজা করিবে, অর্থাৎ পতি, শ্বশুর প্রভৃতির পূজা করিবে। (১০) গৃহাগত দেবতাদিগের অর্চনা করিবে, অর্থাৎ প্রব্রাজক ও অতিথি প্রভৃতিকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা এবং সেবা-যত্ন করিবে।

বিশাখা তাহার জীবনে এই উপদেশসমূহ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বিশাখার শ্বশুর মৃগার নিগ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র নামক তীর্থিকের শিষ্য ছিলেন। বিবাহের পর মৃগার পুত্রবধূ বিশাখাকে লইয়া গুরুদেবের পূজা করিতে গমন করিয়াছিলেন। বিশাখা দেখিলেন তীর্থিক সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। নিগ্রন্থ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃগারকে বলিলেন,—"তুমি এই বধূকে তোমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, এই বধূ অলক্ষণা। এ গৌতমের শিষ্য। যদি ইহাকে বহিষ্কৃত করিয়া না দাও, তাহা হইলে তোমার সর্বনাশ হইবে।"

মৃগার গুরুদেবের কথায় ভীত হইয়া বলিলেন—"গুরুদেব, আমার পুত্রবধূ বালিকা মাত্র, তাহাকে ক্ষমা করিবেন।"

আর একটি ঘটনায়ও মৃগার পুত্রবধূর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একদিন একজন অর্হৎ ভিক্ষার্থে মৃগারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিশাখা অর্হৎকে বলিলেন—"আপনি অন্যত্র ভিক্ষার্থে গমন করুন, এ বাড়ীর কর্তা 'পুরাণ' অর্থাৎ পর্যুষিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

মৃগার এই কথা শুনিয়া বিশাখাকে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিশাখা শ্বশুরের সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আমি এ বাড়ীর ক্রীতদাসী নহি যে, আপনি ইচ্ছা করিলেই যে কোন মুহূর্তে আমাকে দূর করিয়া দিতে পারিবেন। আমার রক্ষার্থ পিতা আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে আসিতে বলুন।" মৃগার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। তখন বিশাখা সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"আমার শ্বশুর 'পুরাণ' খাইতেছেন, অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করিতেছেন। আপনারা আমাকে পিতৃগৃহে লইয়া চলুন।"

একদিন রাত্রিকালে বিশাখা একটা আলোক লইয়া গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন। মৃগার তাহা দেখিতে পাইয়া বিশাখাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশাখা বলিলেন—"একটি অশ্বী শাবক প্রসব করিয়াছে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম।" তখন মৃগার বলিলেন—"তোমার পিতা তোমাকে ঘরের আলো বাহিরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তবে তুমি তাহা করিলে কেন?"

বিশাখা বলিলেন "—আমার পিতা নিন্দা, কুৎসা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়াই 'অগ্নি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমি কখনও ঘরের কথা বাহিরে বলি না।" এইরূপ বলিয়া বিশাখা শ্বশুরের নিকট একে একে পিতৃদত্ত সমুদয় উপদেশগুলির অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এইবার মৃগার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বিশাখা বলিলেন—"তবে আমি এখন পিতৃগৃহে গমন করি।" মৃগার বলিলেন—"মা, তুমি আমাকে আর লজ্জা দিও না। তুমি এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইও না।"

বিশাখা বলিলেন,—"আপনি তীর্থিকদের মতাবলম্বী, আমি ত্রিরত্নের উপাসিকা। আপনি যদি আমাকে ইচ্ছামত দান করিতে এবং ধর্মোপদেশ শুনিতে অনুমতি দেন তাহা হইলে আমি আপনার গৃহে থাকিব, নচেৎ নহে।" মৃগার তাহাতেই সম্মত হইলেন, আর কোন আপত্তি করিলেন না।

বুদ্ধদেব যখন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন বিশাখা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রচুর আয়োজন

করিলেন। একদিন বিশাখার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব শিষ্যমণ্ডলী সহ মৃগারের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন।

ভোজনান্তে বুদ্ধদেব যখন সুখোপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে বিশাখা প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"ভগবান্! আমার কয়েকটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন।"

বুদ্ধদেব প্রশান্তোজ্জ্বল হাস্যে বলিলেন—"বৎসে! তোমার অভিলাষ জ্ঞাপন কর, তবে তোমার সমুদয় প্রার্থনা রক্ষিত হইবে কি না বলিতে পারি না।"

বিশাখা বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন ভিক্ষুদিগকে বর্ষায় বস্ত্রদান করিব। কোন ভিক্ষু পীড়িত হইলে আমি তাহাকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিব এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ, ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান, এই সকল সৎপাত্রে দান করি ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

বুদ্ধদেব কহিলেন—"বিশাখা, তুমি তোমার অভিপ্রায় বেশ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর।"

তখন বিশাখা বলিতে লাগিলেন—"দেব! এখানে নানা দেশ হইতে বহু ভিক্ষু আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই এখানকার পথঘাটের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে বিশেষ ক্লেশ হয়। আমার ইচ্ছা আমি তাঁহাদিগকে অন্নদান করি। তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ধর্মাচরণ এবং নগর পরিভ্রমণে সমর্থ হইবেন। কোন পরিব্রাজক শ্রমণ, ভ্রমণের সময় অন্নসংগ্রহের চিন্তায় বিব্রত থাকিলে তিনি হয়ত তাঁহার দলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন। নতুবা তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না। তিনি যদি আমার অন্নসত্র হইতে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে পান তাহা হইলে এইরূপ কষ্টভোগ হয় না। তিনি বিশ্রাম করিতেও পারেন এবং ইচ্ছামত ভ্রমণ করিবার সুযোগও তাঁহার ঘটে। পরিব্রাজকদিগকে অন্নদান—ইহাই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা।

"প্রভো! আমার আর একটি নিবেদন এই যে, অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, অচিরাবতী নদীতে ভিক্ষুণীরা স্নান করিতে নামেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে বারাঙ্গনারাও একই সময় স্নান করিতে আসে। এই নির্লজ্জা স্ত্রীরা ভিক্ষুণীদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকে—'তোমরা এ বয়সে ধর্মসাধনের জন্য এত কষ্ট করিতেছ কেন? যৌবন প্রমোদ-বিলাসের মধ্য দিয়া অতিবাহিত কর। শেষবয়সে ধর্ম করিও, তাহা হইলে ইহকাল এবং পরকাল দুই-ই রক্ষা হইবে।'

"বারাঙ্গনাদের এইরূপ উপহাসে ভিক্ষুণীরা বড়ই লজ্জিতা হইয়া থাকেন, লজ্জাই নারীর ভূষণ, বিবস্ত্রা হইয়া নদীতে স্নান করিতে নামা তাঁহাদের পক্ষে শোভন নহে, তাঁহাদের স্নানবস্ত্র যোগাইতে পারি, এই আমার তৃতীয় ভিক্ষা।"

বুদ্ধদেব বিশাখার এইরূপ কল্যাণজনক লোকহিতকর প্রস্তাবের কথা শুনিয়া বলিলেন—"বৎসে! তোমার এই সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক! আমি আশীর্বাদ করি ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে পানীয় দান, পরিশ্রান্ত জনে আসনদান, রোগীকে ঔষধপথ্য প্রদান—অশন বসন, ঔষধপথ্য যাহার যা চাই তাহা যথেচ্ছ দান করিবার ক্ষমতা তোমার অক্ষয় হউক। পরের দুঃখ হরণ ও কুশল বর্ধন এই সকল পুণ্যকার্যে নিরন্তর রত থাকিয়া স্বর্গে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ করিতে থাক।"

বুদ্ধদেবের এই আশীর্বাদ-বাণী বিশাখা তাঁহার জীবনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশাখার নিকট বৌদ্ধসঙ্ঘের ঋণ বড় কম নহে। তিনি নগরের পূর্বদিকস্থ একটি সুরম্য উদ্যান সঙ্ঘে উৎসর্গ করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন 'পূর্বারাম।'

বিশাখা তাঁহার শ্বশুর মৃগারকে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। মৃগার বুদ্ধদেবের সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া বিশাখাকে বলিয়াছিলেন—"মা, এতদিনে তুমি এই হতভাগ্য সন্তানের উদ্ধার সাধন করিলে।" তদবধি বিশাখা 'মৃগার মাতা' নামে অভিহিতা হইতে থাকেন।

বিশাখার দশটি পুত্র ও দশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রত্যেকের আবার দশটি করিয়া সন্তান জন্মিয়াছিল। এই দুই শত পৌত্র-দৌহিত্রাদির আবার কুড়িটি করিয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই সকল সন্তানেরা সকলেই সুস্থ, সবল, নীরোগ এবং চরিত্রবান্ ছিলেন। বিশাখা এইরূপ শক্তিশালিনী মহিলা ছিলেন যে, তিনি মত্ত হস্তীকেও শুণ্ডে ধরিয়া নিশ্চল রাখিতে পারিতেন।

এই পুণ্যবতী মহিলা পরিণত বয়সে অতুল সুখসৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া নির্বাণ লাভ করেন। বিশাখার নাম উজ্জ্বল হীরকের ন্যায় জ্যোতিঃমণ্ডিত হইয়া চিরকাল বৌদ্ধশাস্ত্র আলোকিত করিবে।

সুপ্রিয়া

অনাথপিণ্ডদের নাম বৌদ্ধশাস্ত্রে সুবিখ্যাত। ইহার প্রকৃত নাম সুদত্ত। একদিকে যেমন ছিল তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য, তেমনই ছিল তাঁহার সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি। সুদত্তের দানশীলতার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিল। দীন নরনারীর সাহায্য ও আশ্রয় দানের জন্য তিনি অনাথপিণ্ডদ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সুপ্রিয়া ছিলেন এই বণিকশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদের কন্যা। সুপ্রিয়া পুণ্যবান অনাথপিণ্ডদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠিপরিবারকে যশো-গৌরবমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

শৈশব হইতেই সুপ্রিয়া বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন। যখন তিনি সাত বৎসরের বালিকামাত্র সেই সময়ে অনাথপিণ্ডদের গৃহে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সেই সুপণ্ডিত ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করেন। বালিকা সুপ্রিয়া বৌদ্ধভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক সেই সকল সারগর্ভ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া এতদূর অভিভূতা হইলেন যে, তিনি বালিকা বয়সেই সংসার ত্যাগ করিয়া মঠে গমন পূর্বক বিদ্যালাভের জন্য সমুৎসুকা হইলেন। অনাথপিণ্ডদ কন্যাকে এত অল্প বয়সে সংসারত্যাগিনী হইয়া বৌদ্ধমঠে গিয়া জ্ঞানার্জন করা সঙ্গত নহে, এই কথা বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সুপ্রিয়ার প্রাণে জ্ঞানোপার্জনস্পৃহা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহিলেন না।

অনাথপিণ্ডদ শেষটায় বাধ্য হইয়া কন্যাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। গৌতমী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিলেন। এইভাবে সুপ্রিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া কঠোর তপ ও সাধনা দ্বারা একদিকে জ্ঞানোপার্জন ও অন্যদিকে ধর্মোপার্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরেই অসাধারণ সাধনাবলে তিনি "অর্হতী" পদবী লাভ করিয়া-ছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ হইতেই বিশেষভাবে সেবাধর্মের প্রচার হইয়াছিল। সে যুগে নারীগণের নিকট সেবাধর্ম অতি শ্রেষ্ঠ ধর্মের আদি বলিয়া বিবেচিত হইত। সুপ্রিয়া জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করিয়া সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যেখানে রুগ্ন, যেখানে বিপন্ন, যেখানে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী ব্যাধির

বেদনায় এবং রোগযন্ত্রণায় হাহাকার করিত, সেখানেই সুপ্রিয়া প্রাণভরা মমতা লইয়া অগ্রসর হইতেন, তাহাদের সেবা করিতেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীকে অন্নদান করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেন। এই সকল হতভাগ্য নরনারীর দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতেন। যে অনাথপিণ্ডদ অতুল ধনসম্পদের অধিকারী মহাবিভবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার কন্যা হইয়াও এই মনস্বিনী নারী আপনাকে ত্যাগের পুণ্যধারায় প্লাবিত করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়াছিলেন জনসেবার নিমিত্ত। তাঁহার এই দান বহুলোকের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

একবার দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দেশের চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনাহারে শত শত লোক প্রাণ দিতে লাগিল। সে সময়ে সুপ্রিয়া যেভাবে দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্য আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য বলিতে হইবে। তিনি সেবার ও ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা বহু দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জীবন বাঁচাইয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় সুপ্রিয়ার জনসেবার মধুর অনবদ্য চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার চিত্তে সুপ্রিয়ার বদান্যতার কথা অমর করিয়া রাখিয়াছেন। 'কল্পদ্রুমাবদানে' সুপ্রিয়ার অন্নদান-চিত্রটি বর্ণিত আছে।

সত্য সত্যই সেই দারুণ দুর্ভিক্ষে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া ভিক্ষান্নদ্বারাই বসুধা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে যাইতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি শিষ্যগণ-সহ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেই নিবিড় বনের মধ্যে খাদ্যের সংস্থান হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনরূপে সুপ্রিয়া জানিতে পারিলেন যে, অরণ্যমধ্যে বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা খাদ্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছেন। সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া শিষ্যদিগের খাদ্যাভাবক্লেশ দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র হস্তে পথে ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন। একপাত্র অন্ন ভিক্ষা করিয়া সুপ্রিয়া পুনরায় অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া সেই একপাত্র অন্ন দ্বারা বুদ্ধদেবের শত শত শিষ্যকে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। সকলের তৃপ্তিসহকারে ভোজন শেষ হইলে যোগবলদ্বারা ভিক্ষাপাত্র অমৃতরসে পূর্ণ করিয়া, সকল শিষ্যকে পান করাইয়াছিলেন।

সুপ্রিয়ার অসাধারণ জনসেবা এবং অলৌকিক শক্তি দেখিয়া একদিন

কথাপ্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—পূর্বজন্মে সুপ্রিয়া বারাণসীধামে একজন ধনী বণিকের গৃহের পরিচারিকা ছিলেন। একদিন প্রভুর জন্য সুমিষ্ট পিষ্টক লইয়া পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় কাশ্যপ এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য যাইতেছিলেন। পরিচারিকা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া কাশ্যপকে দেখিবামাত্র তাঁহার হস্তস্থিত পিষ্টক প্রদান করিলেন। কাশ্যপ পরিচারিকার এইরূপ বদান্যতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। পরিশেষে সেই পরিচারিকা কাশ্যপের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া নির্বাণপথের পথিক হইয়াছিলেন। পূর্বজন্মের সেই পরিচারিকাই এই জন্মের অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়া। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই সে এইরূপ অসামান্য প্রতিভা, বদান্যতা ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়াছে।

সুজাতা (২)

বুদ্ধদেবের সাধনার সময় যে ধনী ভূম্যধিকারীর পত্নী সুজাতা পায়সান্ন দ্বারা বুদ্ধদেবকে সিদ্ধিলাভের পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এইবার আমরা আর একজন সুজাতার কথা বলিতেছি, এই সুজাতা কোপনস্বভাবা এবং অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা এবং সদুপদেশ দ্বারা মানুষের চিত্তের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এই সুজাতার চরিত্র হইতে তাহা বেশ জানিতে পারা যায়।

অনাথপিণ্ডদেব কথা পূর্বেই সুপ্রিয়ার প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই সুজাতা ছিলেন অনাথপিণ্ডদের এক পুত্রবধূ। সুজাতার রুক্ষ স্বভাব ও দুর্ব্যবহারের জন্য শ্রেষ্ঠি-পরিবারের সকলেই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। সুজাতা ধনী পিতার আদরিণী কন্যা ছিলেন বলিয়া কাহাকেও সম্মান করিয়া চলিতে জানিতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবের উপদেশ-মন্ত্রে সুজাতার চরিত্রে আশ্চর্যরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আমরা এখানে সেই কাহিনীটি বলিতেছি।

একদিন বুদ্ধদেব ভিক্ষাপ্রার্থিরূপে পর্যটন করিতে করিতে বণিক অনাথপিণ্ডদের বাড়ী আসিয়া উপনীত হইলেন।

বুদ্ধদেব যখন অনাথপিণ্ডদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে বাড়ীর মধ্যে ভয়ানক কলহ ও মহাকলরব চলিতেছিল। বুদ্ধদেব একজন সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর বাড়ীর অন্তঃপুরমধ্যে এইরূপ কলরব শুনিতে পাইয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং অনাথপিণ্ডদকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"আপনার বাড়ীতে এইরূপ গোলমাল কেন? মনে হয় যেন মেছুনীদের মাছ চুরি গিয়াছে।"

অনাথপিণ্ডদ লজ্জিত হইয়া দুঃখের সহিত সমুদয় কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আমার একটি পুত্রবধূ বড়ঘরের মেয়ে; সে আজ আমার বাড়ীতে আসিয়াছে। এই পুত্রবধূটি একান্ত অবাধ্য, কাহারও কথা বা উপদেশ সে মানিতে চাহে না; স্বামীর কথাও শোনে না, শ্বশুরশাশুড়ীর অবমাননা করে—বুদ্ধের প্রতিও তাঁহার কোনও শ্রদ্ধা কিংবা ভক্তি নাই।" বুদ্ধদেব এইরূপ ভাবে অনাথ-পিণ্ডদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, অনাথপিণ্ডদ তাঁহাকে একজন সাধারণ ভিক্ষু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

বুদ্ধদেব অনাথপিণ্ডদকে কহিলেন—"আপনি একবার আপনার পুত্রবধূকে আমার নিকট আসিতে আহ্বান করুন।" অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধদেবের আদেশ পালন করিলেন। সুজাতা বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া তাঁহার সৌম্যমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধা হইলেন। বুদ্ধদেব আসন গ্রহণ করিয়া সুজাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুজাতা, স্ত্রী সাত প্রকারের হইয়া থাকে। কেহ ভীমা, কেহ উগ্রচণ্ডা, কেহ কুটিলা ও কলহপ্রিয়া, কেহ প্রিয়ংবদা, কেহ সুশীলা, কেহ সুগৃহিণী, কেহ প্রিয়সখী ও কেহ সেবিকা হয়। বৎসে! তুমি ইহাদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা আমাকে বল।"

সুজাতা এইরূপ প্রশ্নের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার অর্থ আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না, আমাকে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

তখন বুদ্ধদেব স্মিতমুখে বলিলেন—"আমি তোমাকে সব কথা বেশ ভাল ভাবে বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।" তারপর একে একে সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা করিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন—"অসতী স্ত্রী যাহারা তাহারা চপলস্বভাবা ও কুলকলঙ্কিনী হইয়া থাকে। তাহারা স্বামীকে ভালবাসে না, লোকের নিন্দনীয়া হইয়া ইহারা সমাজে অধমা স্ত্রীরূপে পরিচিতা হয়। আর যিনি উত্তমা স্ত্রী তিনি সতীলক্ষ্মী ও পবিত্রতার আদর্শস্থানীয়া হইয়া থাকেন, তাঁহারা

কাছে পতিই পরম নিধি বলিয়া বিবেচিত হয়,—তিনি দাসীর ন্যায় পতির সেবা করিয়া থাকেন, পতির আজ্ঞা ও উপদেশকে তিনি শিরোধার্য করিয়া চলেন।” এই ভাবে উত্তমা, মধ্যমা এবং অধমা স্ত্রীলোকদের বিষয় বলিয়া বুদ্ধদেব কহিলেন,— “সুজাতা, তুমি কোন্ শ্রেণীর স্ত্রী হইতে ইচ্ছা কর ?”

সুজাতা তখন সব কথা বুঝিতে পারিয়া এবং বুদ্ধদেবের পরিচয় জানিতে পারিয়া বলিলেন—“প্রভু! আপনি আমাকে পতিব্রতা সতী স্ত্রী বলিয়া মনে করিবেন। আমি অন্য কোন শ্রেণীর স্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি না।”

তখন বুদ্ধদেব বলিলেন—“বৎসে! তুমি সতী ও পতিব্রতা স্ত্রীরূপে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ জানিয়া আমি প্রীতি লাভ করিলাম। তবে মনে রাখিবে যে, স্বামী-স্ত্রী এই দুইজনের মধ্যে উভয়েরই উভয়ের প্রতি কর্তব্য আছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য হইতেছে—সম্মান প্রদর্শন, ভালবাসা, একনিষ্ঠতা, ভরণপোষণ ও বেশভূষার ব্যাপারে তুষ্টিসাধন। আবার স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হইতেছে— গৃহকার্যে দক্ষতা, অতিথিসেবা, সতীত্ব রক্ষা, মিতব্যয়িতা এবং শ্রমশীলতা। কেমন, তুমি এই সকল উপদেশ পালন করিয়া চলিতে পারিবে ত’ ?”

সুজাতা বুদ্ধদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—“হাঁ প্রভু! আমি কায়মনো-বাক্যে আপনার এই আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিব।” বুদ্ধদেব তখন প্রসন্ন-মঙ্গল-হাস্যে সুজাতাকে আশীর্বাদ করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেদিন হইতে কলহপ্রিয়া, কোপনস্বভাবা সুজাতার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিল— তাঁহার বিনীত ও সুমিষ্ট ব্যবহার, পাতিব্রত্য, গুরুজনের সেবা ও সত্যধর্ম পালন করিয়া চলা প্রভৃতি বিবিধ গুণ তাঁহাকে আদর্শ মহিলার গুণগরিমায় ভূষিত করিয়াছিল।

সতী সম্বুলা

—এক—

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের স্বস্তিসেন নামে এক পুত্র ছিলেন। স্বস্তিসেন সুন্দর, সবল, শিক্ষিত ছিলেন এবং যুদ্ধকার্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করায়, রাজা তাহাকে বয়ঃপ্রাপ্তির পরেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। স্বস্তিসেনের সহিত এক পরম রূপবতী রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার নাম ছিল সম্বুলা। সম্বুলা এমন সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁহার রূপপ্রভা দীপশিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। স্বস্তিসেন এইরূপ সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়া পরম আনন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সুখদুঃখ বিধাতার দান। মানুষ ইচ্ছা করিলেন সুখী হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিধাতার কঠোর বিধান সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়। স্বস্তিসেনও বেশি দিন সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার শরীরে কুষ্ঠরোগ জন্মিল। রাজবাড়ীর প্রাচীন চিকিৎসকেরা প্রাণপণ চিকিৎসা করিয়াও যুবরাজকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। যখন সেই দুষ্ট কুষ্ঠব্রণগুলি পাকিয়া ফাটিতে লাগিল তখন তাঁহার আকৃতির এইরূপ পরিবর্তন হইল যে, তিনি নিজেই আপনার বীভৎস রূপ দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং রাজা ব্রহ্মদত্তকে বলিলেন—"পিতা, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই, আমি রাজ্য, রাজধানী বা ধনরত্ন দিয়া কি করিব? আমার আর রাজধানীতে থাকিবার ইচ্ছা নাই, আমি নিবিড় বিজন বনে গিয়া বাস করিব।"

রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু শেষটায় পুত্রের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

স্বস্তিসেন বনে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এইরূপ সময়ে সম্বুলা আসিয়া বলিলেন—"প্রিয়তম! সাধ্বী স্ত্রীর পতিসেবাই একমাত্র ধর্ম; আমিও আপনার সহিত বনে যাইব এবং সেখানে আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।" স্বস্তিসেন বলিলেন—"প্রিয়তমে! বিধাতার অভিশাপে আমি এই দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত

হইয়াছি ; যদি বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ ও শান্তি লিখিতেন তাহা হইলে আমি কখনই এইরূপ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতাম না। আমার আর জীবনধারণের ইচ্ছা নাই। আমি বনে যাইয়া জীবন ত্যাগ করিব, ইহাই আমার একমাত্র সঙ্কল্প।" সম্বুলা স্বামীকে কহিলেন—"আমি আপনার এ কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমি বনে যাইয়া আপনার সেবা করিব। আপনার সহধর্মিণী হইয়াও যদি আমি এই সেবাব্রত গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমি ধর্মে পতিত হইব।"

স্বস্তিসেন সম্বুলাদেবীকে কোনরূপেই নিরস্ত করিতে পারিলেন না। সম্বুলা পতির সহিত বনে গমন করিলেন।

—দুই—

স্বস্তিসেন ও সম্বুলা এক নিবিড় বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার এক রমণীয় প্রদেশে একখানা পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা সম্বুলা স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সম্বুলা যে ভাবে পতির সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন তাহা প্রকৃতপক্ষেই অপূর্ব বলিতে হইবে। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আশ্রমটিকে অতি সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করিতেন, তারপর রাজকুমারের হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের জন্য দন্তকাষ্ঠ, জল ইত্যাদি আনিয়া দিতেন। রাজকুমার হস্ত ও মুখ ইত্যাদি প্রক্ষালন করিলে পর, সম্বুলা বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া স্বামীর ক্ষতস্থানগুলিতে অতি যত্নের সহিত প্রলেপ দিতেন। বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন এবং বনফুল চয়ন করিয়া আনিয়া পতির চরণযুগল পূজা করিতেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর স্বামীর মুখ ও হাত ধোয়াইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতেন—"আপনি সতর্ক ভাবে কুটীরে অবস্থান করিবেন।" এইরূপ বলিয়া সম্বুলা ঝুড়ি, খন্তা ও অঙ্কুশ লইয়া ফলপুষ্প-সংগ্রহের নিমিত্ত প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে বনে প্রবেশ করিতেন।

ফুল ও ফল ইত্যাদি বন হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সেগুলি কুটীরমধ্যে সযত্নে রক্ষা করিতেন এবং কলস পুরিয়া জল আনিয়া, বিবিধ প্রকারের ঔষধের চূর্ণ এবং মৃত্তিকা মাখাইয়া স্বামীকে স্নান করাইতেন। আহারের পর সুবাসিত জল পানের জন্য প্রদান করিতেন। পতিদেবতার সন্তোষবিধান ও সেবার নিমিত্ত তাঁহার পরিশ্রমের এতটুকু ত্রুটি হইত না।

এইভাবে স্বামীর আহার ও সেবা সম্পন্ন করিয়া নিজে সামান্য ফলমূল আহার করিয়া একখণ্ড বিস্তৃত কাষ্ঠফলকের উপর স্বামীকে শোয়াইয়া তাঁহার মাথায়, পিঠে ও পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্বামীকে ঘুম পাড়াইতেন। তারপর নিজে সেই শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিতেন। এইরূপ ভাবে অতি যত্নে পতিকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা ইত্যাদি করিয়া, সেই নিবিড় বনে তাঁহার দিন কাটিতেছিল।

—তিন—

একদিন সম্বুলা ফলফুল আহরণ করিতে করিতে এক অতি সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। সেই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে নানাজাতীয় তরুশ্রেণী ঘন পত্রপল্লবে শোভিত হইয়া শ্যামল সুষমা বিস্তার করিয়াছিল। শাখায় শাখায় পাখীরা সব কলরব করিতেছিল। লতায় লতায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া হাসিতেছিল। আর একটি পার্বত্য নির্ঝরিণী সেই নীরব বনপ্রান্ত বহিয়া কুলুকুলু রবে চারিদিক মুখরিত করিয়া, ধীরে অতি ধীরে, প্রবাহিত হইতেছিল। সম্বুলা কোনদিন এমন সুন্দর স্থানে আসেন নাই; কাজেই এস্থানের অপরূপ সৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার মাথা হইতে ফলের ঝুড়িটা নামাইয়া, সেস্থানে কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন এবং নিজের দেহে হরিদ্রা মাখিয়া ঐ নির্ঝরিণীর জলে স্নান করিলেন। স্নানান্তে বল্কল পরিধান পূর্বক আলুলায়িত কুন্তলে যখন দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার দেহের রূপজ্যোতিতে সমস্ত বনে বিদ্যুৎপ্রভা বিকশিত হইল। ঠিক এই সময়ে এক দুষ্টপ্রকৃতির দানব সেই বনমধ্যে আহারান্বেষণে বিচরণ করিতেছিল।

সে সম্বুলাকে দেখিয়া কহিল—

কে তুমি সুন্দরি! বন আলো করি
বিরাজিছ এই কানন মাঝে?
গঠিত সুন্দর উরু মনোহর
হেরি রম্ভাস্তম্ভ মরে লাজে!

এ গিরিকন্দরে, কাঁপিতেছ ধীরে,
কে তুমি ? কোথা বন্ধু, কোথা প্রিয়জন ?
সিংহ, ব্যাঘ্র আদি যত, হিংস্র জন্তু অগণিত
এ বনেতে করে আগমন।
কাহার ঘরনী হে মনোমোহিনী
বল তব পরিচয় মোরে,
আমি দৈত্য বলী, করি কৃতাঞ্জলি
তোমায় জানাই মম প্রীতি নমস্কারে !

সম্বুলা দৈত্যের এইরূপ সম্বোধনে বিন্দুমাত্রও বিচলিতা হইলেন না। তিনি নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন,—

স্বস্তিসেন স্বামী, কাশীরাজের নন্দন,
আমি তাঁর প্রিয় পত্নী, করহ শ্রবণ।
সম্বুলা আমার নাম, রাজার নন্দিনী,
রোগগ্রস্ত পতি মম, আমি অভাগিনী—
নিবিড় বিজন দেশে পাতার কুটীরে
স্বামী সহ করি বাস, সেবা করি তাঁরে।
দিবানিশি, বনে বনে করিয়া ভ্রমণ,
আনি মধু, আনি মাংস, যা পাই যখন।
আনি ফুল, আনি ফল, করিয়া যতন,
পতিই দেবতা মোর সরবস্বধন।
পতি মোর ধর্মকর্ম, পতিসেবা সার,
করিয়াছি লক্ষ্য মোক্ষ, জীবনে আমার !
আজিকে বিলম্ব হল—না জানি কেমনে,
রয়েছেন প্রিয়তম মলিন বদনে।
এই মম পরিচয় দিলাম তোমারে,
তুষ্ট হও, লও মম প্রীতি নমস্কারে।

তখন সেই দুষ্ট দানব কহিল,—

রোগক্লিষ্ট রাজপুত্রে সেবাযত্ন করি
কি লাভ হইবে তব বল ত সুন্দরী ?

এস তুমি—মোর গৃহে হও গো গৃহিণী,
কোন ক্লেশ নাহি রবে, রাজার নন্দিনী।
চারিশত ভার্যা মোর রহিয়াছে ঘরে,
তোমারে রাখিব আমি সবার উপরে।
সাজাইব নব সাজে বসনভূষণে,
শত রত্ন অলঙ্কারে ওগো, বরাননে !
যা চাহিবে তাই দিব, নাহি কোন দুখ,
দিব প্রেম ভালবাসা অফুরন্ত সুখ।
যদি তুমি মোর বাক্য কর প্রত্যাখ্যান,
তোমারে বধিব প্রাণে এ মোর বিধান।

সম্বুলা দৈত্যের এইরূপ ভীতিপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন :—

শোকে, দুঃখে জীর্ণ দেহ বিরূপবদন,
তাহারে সুন্দরী দৈত্য কহ কি কারণ ?
মোর চেয়ে শত গুণে রূপসী রমণী,
অনায়াসে পাবে তুমি করিতে গৃহিণী।

দৈত্য ইহাতে নিরস্ত হইল না। সে তাহার নিষ্ঠুর পিঙ্গলবর্ণ হস্ত বাহির করিয়া সম্বুলাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন সম্বুলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—

রাক্ষসে করিবে মোর জীবন বিনাশ,
তাহাতে নাহিক প্রাণে আমার তরাস।
কিন্তু হায় ! হতভাগ্য স্বামীর আমার,
আমার মৃত্যুতে হবে কি দশা তাঁহার ?
এ কথা ভাবিয়া প্রাণে জাগিছে বেদনা,
কোথা স্বর্গ ? দেবগণ ? তোমরা শুন না ?
বনমাঝে একাকিনী অবলার মান
দুষ্টপাপী নাশহেতু হয় আগুয়ান !
কোথা লোকপাল সবে ? দেবরাজ কোথা ?
রক্ষা কর, রক্ষা কর ! করোনা অন্যথা,
নারীর সতীত্বগর্ব শ্রেষ্ঠ তার মান,
তার কাছে তুচ্ছ দেব নারীর পরাণ !

—চার—

দেবরাজ সম্বুলার এই আহ্বান স্বর্গরাজ্যে বসিয়াই শুনিতে পাইলেন। সতীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য তিনি বজ্রহস্তে সেই নিবিড় পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ সেই দুষ্ট দৈত্যের মাথার উপরে রথারোহণে বসিয়া বলিলেন :—

"সতীত্বের শিরোমণি, জিতেন্দ্রিয়া ধনী,
সুপণ্ডিতা অগ্নিসমা ইনি তেজস্বিনী,
এমন সতীর দেহ করিবি ভক্ষণ,
এত স্পর্ধা দৈত্য তোর ? করিব নিধন
তোরে। ছাড় ত্বরা করি, বিলম্ব না আর।
নহিলে করিব তোরে বজ্রের প্রহার।
পতিব্রতা নারীদেহ করিতে পরশ,
জগতে কাহার সাধ্য ? কাহার সাহস ?
ছাড়্ শীঘ্র দৈত্য ওরে, আদেশ আমার,
নতুবা করিব তব জীবন-সংহার।"

দৈত্য তৎক্ষণাৎ সতী সম্বুলাকে ছাড়িয়া দিল। দেবরাজ তখন পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক সেই দৈত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক নিবিড় দুর্লঙ্ঘ্য পার্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন। সেখান হইতে আর তাহার বাহির হইয়া আসিবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। এইবার দেবরাজ সম্বুলাকে নিশ্চিন্ত মনে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করিলেন। তখন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। সম্বুলা চঞ্চলা উন্মাদিনীর মত চঞ্চল বেগে শুভ্র জ্যোৎস্না-লোকে আশ্রমের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

—পাঁচ—

দৈব প্রভাবে রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্বুলা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য। স্বস্তিসেন সেখানে নাই। সতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ঋষি পুণ্যবান জন,
সম্ভাবি সবায় আমি করি নিবেদন,

বলে দাও কোথা গেলে পতিরে আমার,
ফিরিয়া পাইব বল,—তোমা সবাকার
চরণে মিনতি এই—আমি অভাগিনী,
শাবক হারায়ে কাঁদে যেমন পক্ষিণী
তেমনি দুর্দশা মোর।—বল বল মোরে,
কোন্ পথে গেলে পাব পতিদেবতারে ?
সিংহ, ব্যাঘ্র, যত সব বন্য প্রাণিগণ,
বল মোরে কোন্ পথে করিব গমন ?
কোথা গেলে মিলিবেক পতির সন্ধান,
জান যদি বল সবে কর পরিত্রাণ
দারুণ বিপদে মোরে, বল তরুলতা,
কোথায় আমার প্রভু, আমার দেবতা ?
বল পুষ্প হাসিমুখে, অভাগিনী মোরে,
তোমরা কি দেখিয়াছ আমার পতিরে ?
ইন্দীবর-শ্যামা নিশি নক্ষত্রমালিনী,
শোন মোর কথা মা গো, আমি অভাগিনী
করযোড়ে করিতেছি মিনতি তোমায়,
কোথায় আমার পতি! বল না আমায়।
তুষারধবল শৃঙ্গ ওগো হিমালয়,
তোমার চরণ বন্দি, হওগো সদয়।
কোন্ পথে গেলে পাব পতি দরশন,
কৃপা করি বল মোরে—করি নিবেদন।

স্বস্তিসেন দূর হইতে সম্বুলার এই করুণ আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। এ সময়ে স্বস্তিসেনের মনে এই সেবারতা পরমা সাধ্বী পত্নীর সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব উপস্থিত হইল। তিমি মনে মনে ভাবিলেন—সম্বুলার মনের প্রকৃত ভাব কি তাহা ত জানি না। যদি সম্বুলা সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত এইরূপ করুণ আর্তনাদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ত ইহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই সময় ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এইরূপ মনে করিয়া স্বস্তিসেন পর্ণকুটীরের দ্বারে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এদিকে সম্বুলা বনের চারিদিকে করুণ আর্তনাদ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে

পুনরায় কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া স্বস্তিসেনকে দেখিতে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং স্বামীর চরণ বন্দনা পূর্বক কহিলেন—"প্রভু! আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি যে আপনার অন্বেষণে সমস্ত বন পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

স্বস্তিসেন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তুমি ত কোন দিন এইরূপ বিলম্ব কর না, তবে অদ্য তোমার এইরূপ বিলম্ব হইবার কারণ কি?"

তখন সম্বুলা বনমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল স্বামীর নিকট সে সকল কথা বর্ণনা করিলেন। সব কথা শুনিয়া স্বস্তিসেন বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীজাতির চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা অতি কঠিন কার্য, তাহাদের চরিত্রে সত্য নামক পদার্থ নাই। এই হিমালয়ে বহু তাপস, বহু ঋষি, বহু বিদ্যাধর, বহু বনচর প্রভৃতি বাস করিয়া থাকেন; এরূপ স্থলে আমি তোমাকে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?

নারীর চঞ্চল মতি বুদ্ধি চমৎকার,
সত্য ও অসত্যে করে সমব্যবহার।
নীর মধ্যে মৎস্যগতি বোঝে কোন্ জন?
নারীর চরিত্র বোঝা কঠিন তেমন।

সম্বুলা সতীত্বগর্বে গর্বিতা তেজস্বিনী নারী, তিনি স্বামীর কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া বলিলেন,—"আপনি আমাকে বিশ্বাস না করিলেও, আজ আমি নিজ সত্যদ্বারা আপনার রোগ আরোগ্য করিব।" এই কথা বলিয়া সম্বুলা একটি কলসী জলপূর্ণ করিয়া স্বস্তিসেনের শিরে সেচন করিতে করিতে দেবতার নাম স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

সত্য পবিত্রতা বলে, রক্ষা আমি পেয়েছি যেমন,
সত্য মোরে সদা রক্ষা প্রতি পদে করিবে তেমন।
তুমি স্বামী, তুমি প্রভু, তুমি যে গো দেবতা আমার,
এ সংসারে তোমা হ'তে প্রিয়তম নাহি কেহ আর।
সত্যধনে বুকে রাখি করিতেছি সলিল সেচন,
সতী যদি হই আমি, মম বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
রোগমুক্ত হবে তুমি—সত্য কভু বিফল না হয়,
পীড়া উপসম তব জেন নাথ! হইবে নিশ্চয়।

সতীবাক্য কি কখন মিথ্যা হইতে পারে? সম্বুলার জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গেই

স্বস্তিসেনের কুষ্ঠক্ষতসমূহ অদৃশ্য হইল। অগ্নিস্পর্শে যেমন তাম্রের কলঙ্ক দূর হয়, সেইরূপ সতীর করস্পৃষ্ট সেই পুণ্যজলধারায় স্বস্তিসেনও রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্তির পর তাঁহারা দুইজনে কয়েকদিন হিমালয়ের সেই নিভৃত বনপ্রদেশে বাস করিয়া, বারাণসীধামে গমনপূর্বক রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রের আগমনবার্তা এবং তৎসঙ্গে রোগমুক্তির কথা শুনিতে পাইয়া পুত্রকে রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন এবং স্বস্তিসেনের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত করাইয়া তাঁহাকে নৃপতির পদে এবং সম্বুলাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্তা করিয়া নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক রাজোদ্যানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

—ছয়—

পুরুষের চরিত্র। স্বস্তিসেন হৃতশ্রী ও যৌবন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্বুলাকে ভুলিয়া গেলেন। সম্বুলা নামে মাত্র অগ্রমহিষী রহিলেন, ভুলিয়াও স্বস্তিসেন তাঁহাকে একবার প্রিয়-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন না, তাঁহার মনস্তুষ্টি করা দূরে থাকুক, তিনি রাজান্তঃপুরমধ্যে আছেন কি নাই তাহারও সন্ধান লইতেন না। স্বস্তিসেন রাজান্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য মহিলাদের সহিত প্রমোদবিলাসে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। স্বামীর এইরূপ অনাদরে সম্বুলা দিন দিন কৃশা ও লাবণ্যহীনা হইতে লাগিলেন, তাঁহার দেহ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিল।

একদিন তপস্বী শ্বশুর ব্রহ্মদত্ত রাজপুরীতে ভোজনার্থ সমাগত হইলে, প্রিয় পুত্রবধূর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—"বৎসে! তোমার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে কেন? তোমার সুখশান্তি বিধানের জন্য শত সহস্র দাসদাসী রহিয়াছে, তোমার রক্ষার জন্য শত শত ধনুর্ধর রহিয়াছে, তবে তোমার দুঃখের কারণ কি?"

সম্বুলা মাথা নত করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে করুণকণ্ঠে বলিলেন,—"দেব! আপনার পুত্র আমার প্রতি স্নেহহীন হইয়াছেন, ইহাই আমার দুঃখের কারণ।"

বৃদ্ধ রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সম্বুলা বলিলেন,—

রাজার নন্দিনী আমি, রাজার গৃহিণী,
অন্ন, পান, ধনরত্ন, রহিয়াছে ঘরে,
রূপ, গুণ, সব আছে, তবু ভিখারিণী
পতিপ্রেম বিনা আছি বিষাদ-অন্তরে।
ধন-রত্ন, তুচ্ছ সব, পতিপ্রেম বিনা,
নারীর কি আছে পিতঃ? সে যে বড় দীনা!

হই দীনা, হই নিঃস্বা, তৃণশয্যা 'পরে,
কাটুক দিবস নিশি—নাহি ডরি তারে!
পতিপ্রেম লভে যদি দীনা কাঙ্গালিনী,
তা'র কাছে সুখী কোথা রাজার নন্দিনী?

রাজা সম্বুলার প্রতি পুত্রের এইরূপ দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি যখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলে তখন কে তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়া তোমার রোগযন্ত্রণায় সেবাশুশ্রূষা ও যত্ন করিয়াছিল? কে তোমাকে স্বীয় সতীত্ব-ধর্মবলে দারুণ ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিল? কাহার কৃপায় আজ তুমি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া প্রমোদ-বিলাসে মগ্ন হইতে পারিয়াছ? হতভাগ্য, তুমি সেই সাধ্বীসতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ! একবার ভুলিয়াও তাঁহার সন্ধান লও না! পতির কল্যাণকামিনী নারী পৃথিবীতে বড় দুর্লভ। পত্নীর প্রতি অনুরাগী বিশ্বস্ত স্বামীও সংসারে অতি বিরল। তুমি সম্বুলার ন্যায় সৌভাগ্যবতী এবং পতিব্রতা নারীকে উপেক্ষা করিয়াছ! সে কেমন আছে, কি ভাবে তাহার দিন কাটিতেছে, তাহার খোঁজ পর্যন্ত লও না। জানি না ইহার চেয়ে গুরুতর পাপ পৃথিবীতে আর কি আছে?" এইরূপ উপদেশ দিয়া বৃদ্ধ রাজা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বস্তিসেন এইরূপ ভাবে পিতা-কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া সম্বুলার নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—"দেবি, তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর। আমার এই রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য, সকলই আমি তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। আজ হইতে তোমার সপত্নী এই রাজকন্যাগণ তোমার সেবা করিবেন ও আদেশ পালন করিয়া চলিবেন।"

সতী সম্বুলার মুখে অপূর্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পতিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"তুমিও আমায় মার্জনা কর।" তারপর দুইজনে প্রীতিসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। সতীর জয় হইল।

মালিনী

—এক—

মালিনীর নাম বৌদ্ধযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে বারাণসী নগরে কৃকী নামে একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি সেকালের বৌদ্ধপ্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও বৈদিক ধর্মাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। রাজা কৃকীর সুশাসনে বারাণসী রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মালিনী কৃকী নৃপতির কন্যা। সে যুগে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই নিজ নিজ কন্যা ও ভগিনীকে সুশিক্ষিতা করিতেন। কৃকী বারাণসীর প্রসিদ্ধ বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের সাহায্যে কন্যা মালিনীকে বৈদিক ধর্মে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মালিনীর যেমন ছিল রূপের খ্যাতি, তেমনি ছিল তাঁহার গুণের খ্যাতি।

মালিনী হিন্দুরাজার কন্যা হইয়াও বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গোপনে পিতার অজ্ঞাতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। একদিন রাজার অজ্ঞাতে রাজপ্রাসাদে কতিপয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া মালিনী দেবী তাঁহাদিগকে অতি পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্থান সময়ে রাজকুমাবী পুঁথিবন্ধনের জন্য প্রত্যেককে ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ড দান করিয়াছিলেন; বৌদ্ধ শ্রমণেরা রাজকুমারীর এইরূপ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

কথাটা গোপন রহিল না। ক্রমে ঘটনা রাজা কৃকীর কর্ণে যাইয়া পৌছিল। এদিকে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের কাছেও ইহা গোপন রহিল না। তাঁহারা রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনার কুমারী কন্যা এই কাজটি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহার যদি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করানই অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে অনায়াসেই বৌদ্ধমঠে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে পারিতেন। শাস্ত্রে আছে অবিবাহিতা কন্যা পিতার অধীন। অতএব আপনার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে শ্রমণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান ব্যাপারটা শুধু ধর্ম-বিগর্হিত যে হইয়াছে তাহা নহে, রাজদ্রোহও হইয়াছে। বৌদ্ধরা আজকাল শুধু যে ধর্মালোচনাই করিতেছেন তাহা নহে। তাঁহারা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দিকেও মনোনিবেশ

করিয়াছেন। এইরূপ স্থলে হিন্দুরাজকন্যা হইয়াও যখন রাজকুমারী বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত হইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। আমাদের শঙ্কা হয় যে, আপনার এই স্বাধীন বারাণসীরাজ্য আপনার কন্যার চক্রান্তে পরহস্তগত হইবে। এরূপ স্থলে রাজনৈতিক যুক্তি হিসাবেও আপনার কর্তব্য এই কন্যাকে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করা। আশা করি আপনি অচিরে এই দণ্ডবিধান করিবেন।" ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের এই উপদেশ অনুসারে রাজা মালিনীকে চিরনির্বাসনদণ্ড প্রদান করিলেন। মালিনী পিতার এই নিষ্ঠুর আদেশ শ্রবণ করিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না, বরং নির্ভীকভাবে আনন্দের সহিতই সেই আদেশ গ্রহণ করিলেন। মালিনী শুধু পিতাকে একটি অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি রাজকন্যা—জন্ম হইতে এপর্যন্ত সুখ ও বিলাসের মধ্যেই লালিতাপালিতা; অতএব নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট এক সপ্তাহ সময় চাহিতেছি।"

মহারাজ কৃকী এই অনুরোধ তন্মুহূর্তেই পালন করিলেন। রাজা ভাবিলেন সাত দিনের মধ্যে মালিনী কি এমন ষড়যন্ত্র করিতে পারিবে যাহাতে আমার রাজ্যের অনিষ্ট করিতে পারে? এজন্য তিনি সাতদিন সময় দিতে কোন প্রকার দ্বিধা করিলেন না। কিন্তু এদিকে তিনি রাজবাড়ীর সর্বত্র কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করিলেন। শ্রমণদিগের রাজপ্রাসাদে প্রবেশলাভ নিষিদ্ধ হইল।

—দুই—

রাজা মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার কন্যা। পিতার সম্মান ও বংশগৌরব রক্ষা করা তোমার একান্ত কর্তব্য। তুমি নির্বাসনদণ্ড পালন করিতে চলিয়াছ, তথাপি তোমার প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে তাহা আমি সম্পাদন করিতে চাই। তোমার নির্বাসনে বাসোপযোগী কি কি দ্রব্য গ্রহণ করিবে তাহা আমাকে বল, আমি সে সকলের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

মালিনী বলিলেন—"পিতঃ! আমার নির্বাসনবাসের জন্য আমাকে কোন দ্রব্যই দিতে হইবে না। আমি আপনার নিকট শুধু একটি অনুমতি চাহিতেছি, সেই অনুমতি প্রদান করিলেই আনন্দিত হইব।"

রাজা।—কি তোমার প্রার্থনা বল!

মালিনী।—আমি এই সাতদিন কাল আপনাদের সকলের নিকট বক্তৃতা করিতে চাহি। সাতদিন আমার বক্তৃতা শুনিয়া যদি আমাকে নির্বাসিত করেন তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।

রাজা চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আমি তোমাকে বক্তৃতা করিতে অনুমতি দিলাম।"

মালিনী বলিলেন—"তাহা হইলে আপনি রাজপ্রাসাদ-মধ্যে বক্তৃতার আয়োজন করুন। রাজবাড়ীর বৈদিকপণ্ডিতগণ এবং মন্ত্রিগণকে আহ্বান করুন। আমি বক্তৃতা প্রদান করিব।"

রাজা সভার ব্যবস্থা করিলেন। ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী মালিনীদেবীর বক্তৃতা দিবার কথা রাষ্ট্র হইবার পর রাজপুরীতে বিস্তর লোক সমাগত হইল। সকলেই রাজকুমারীর মুখের কথা, তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যশ্রীমণ্ডিত মুখশ্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারের সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া সমুৎসুক হইয়া রাজপুরীতে সমবেত হইলেন।

—তিন—

রাজবাড়ীর সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। চন্দ্রাতপতলে সুসজ্জিত আসনে শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্বয়ং রাজা, মন্ত্রিগণ, পণ্ডিতসকল, রাজসেনাপতি, সৈনিকগণ, পুরবাসিগণ —সকলে সমবেত হইয়াছেন। দশসহস্র লোক নীরব ও নিস্পন্দভাবে রাজকুমারী মালিনীর বক্তৃতা শুনিতেছেন। উচ্চ বেদীর উপর দাঁড়াইয়া তিনি নির্ভীকভাবে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার অপূর্ব দেহের শোভা, রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা সাজসজ্জা এবং দীপ্ত যৌবনপ্রভা চারিদিক আলোকিত করিল। মুখশ্রী হইতে বিমল প্রতিভার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছিল।

মালিনী বলিতে লাগিলেন গৌতমের পবিত্র ধর্মের কথা। কেমন করিয়া অবিদ্যা মানুষের সকল দুঃখের মূল হইয়া তাহাকে বিপদাপন্ন করে। কেমন করিয়া মানুষ শোক, দুঃখ, জরা, ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াও, প্রলোভনের মধ্যে বাস করে। অবিদ্যা হইতেই সংস্কার। সংস্কার হইতেই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ। নামরূপ হইতে ষড়ায়তান, অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ। স্পর্শ হইতে বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা। তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা আসক্তি। উপাদান হইতে ভব। ভব হইতে জন্ম। জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ও দুঃখের উদ্ভব। যদি

অবিদ্যাকে নাশ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পর্যায়ক্রমে সংস্কার, সংজ্ঞা, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তারপর পরিশেষে জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক প্রভৃতি সর্বদুঃখের বিনাশ হয়। বুদ্ধদেব এই যে দুঃখের মূল কারণ এবং তাহার বিনাশের কারণ তাহাই ধ্যানযোগে লাভ করিয়াছেন। মালিনী একে একে বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া, বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণের যে কথা আছে তাহা বলিলেন। বুদ্ধদেবের নির্বাণ যে ভাবাভাব এতদুভয়ের অতীত তাহা বলিলেন, বলিলেন—

"ন চাভাবোহপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা।
ভাবাভাব বিনির্মুক্তঃ পদার্থ নির্ব্বাণ মুচ্যতে॥"

দুঃখ, শোক, পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ—শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা ইহাই হইতেছে নির্বাণের অবস্থা। বেদান্তের মতে যেমন জীবাত্মার পরব্রহ্মে লীন হওয়া, বৌদ্ধমতে নির্বাণপ্রলয়-সাগরে ডুবিয়া যাওয়া, ইহার উর্ধ্বে আর কিছু নাই। অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ!

মালিনী সাতদিন পর্যন্ত অহিংসা পরমধর্মের মূলসূত্র, ধর্মের মূল সত্য—একে একে বর্ণনা করিলেন। তাঁহার এইরূপ উপদেশ ও সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে রাজকন্যা মালিনীর অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া কোথায় গেল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কূটতর্কনীতি! কোথায় গেল তাঁহাদের বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধভাব! কোথায় গেল তাঁহাদের রাজকন্যার প্রতি বিদ্বেষভাব! দেখিতে দেখিতে এই সপ্তাহকালমধ্যে রাজা, রানী, ভ্রাতা, ভগিনী, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, পৌরজনগণ সহ দশসহস্র লোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিলেন। রাজপ্রাসাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণমধ্যে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

—চার—

এইভাবে সপ্তাহকাল অতীত হইলে মালিনী নির্বাসনদণ্ড বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বলিলেন—"পিতা, সাতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।"

এখন কে কাহাকে নির্বাসনদণ্ড দিবে ? রাজা নীরব রহিলেন।

মালিনী বলিলেন—"পিতা, আমাকে আপনি বারাণসী রাজ্যের ধ্বংসকারিণী মনে করিয়াছেন,—মনে করিয়াছেন আমার দ্বারা আপনার স্বাধীনতা হ্রাস পাইবে, কাজেই বিঘ্নকারিণী কন্যাকে রাজপুরীতে রাখা কোনরূপেই আপনার কর্তব্য নহে। তবে একটা কথা এই যে, আমি কোন অপরাধেই অপরাধিনী নহি। সংসারত্যাগী বৌদ্ধ শ্রমণগণকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছি বলিয়া কোন অপরাধ করি নাই। সে যাহাই হউক, আমি আপনার কন্যা। পিতৃ-আদেশ পালন করা সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। সপ্তাহকাল অতীত হইয়াছে। আমি আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। আমার নির্বাসনবাসের ব্যবস্থা করুন। আমারও আর এই দুঃখপূর্ণ সংসারে বাস করিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজা কৃকী বলিলেন—"মা, তুমি আর নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইবে কেন ? তোমার ধর্মোপদেশ, তোমার জ্ঞান ও শিক্ষা এবং বক্তৃতার গুণে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সকলেই যে মহাত্মা গৌতমের ধর্মকেই গ্রহণ করিয়াছি। বুঝিয়াছি মহাত্মা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ধর্ম, ভারতবর্ষের জাতীয়তা রক্ষা পাইবে। যজ্ঞক্ষেত্র এতদিন পশুমাংসলোলুপ যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা রক্তস্রোতে প্লাবিত হইত। ভারতে পশুধ্বংসই একমাত্র ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। অমিতাভ আজ দেশে শান্তির বার্তা, প্রেমের বার্তা, মুক্তির বার্তা আনিয়া দিলেন।

"তুমি আমার একটি অনুরোধ পালন কর।—সারনাথ অতি সুন্দর স্থান। উহা আমার রাজধানীর নিকটবর্তী হইলেও, জনকোলাহলে মুখরিত নহে। তুমি সেই শান্তিপূর্ণ পবিত্র স্থানে বৌদ্ধ নারীদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন কর। আমি ঐ বিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিব। নারীর কর্তব্য নারীর মঙ্গলবিধান। তুমি যখন নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ তখন তোমার প্রধান কর্তব্য নারীসমাজের কল্যাণবিধান। ভারতবর্ষের মহিলারা যদি জ্ঞানগরিমায় অলঙ্কৃতা হন তাহা হইলে ভারতবর্ষ চিরদিন পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

"কিন্তু তুমি যদি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া বাস কর, তাহা হইলে জগতের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। আমি জানিতাম না যে তুমি এতদূর জ্ঞান ও বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াছ। আমি জানিতাম না, বুঝিতে পারি নাই—তাই তোমাকে সভাপণ্ডিতগণের কূট পরামর্শে নির্বাসনদণ্ড প্রদান

করিয়াছিলাম। তুমি পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। আমার এই আদেশ পালন কর। তুমি সারনাথে গিয়া মহিলাদিগের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা কর।"

মালিনী পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।"

—পাঁচ—

মহারাজ ক্বকীর আদেশে সারনাথে সুবৃহৎ বিদ্যায়তন নির্মিত হইল। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে দশ হাজার বৌদ্ধমহিলার শিক্ষার ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিবার ভার লইলেন। ছাত্রীগণের বাসের জন্য মঠ নির্মিত হইল। তাহাদের অন্নবস্ত্র প্রভৃতির সংস্থানের জন্য কোন ভাবনা ছিল না। মালিনী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাভবনে আসিয়া ছাত্রীগণের অভিভাবিকা এবং আচার্যারূপে বাস করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং নারীদিগকে ধর্মশিক্ষা প্রদানই হইল মালিনীর জীবনের একমাত্র ব্রত।

মালিনীর বিদ্যাদানের খ্যাতি অচিরেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে দলে দলে মহিলারা সারনাথের বিদ্যায়তনে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। সারনাথ বৌদ্ধ মহিলা-শিক্ষালয়ের কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিল। সারনাথের সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বিদ্যার্থিনী তরুণীগণের কণ্ঠে নির্বাণমুক্তির বাণী ধ্বনিত হইত। সকলে একস্বরে গাহিতেন—

নাত্থি রাগসমো অগ্‌গি নাত্থি দোষসমোকলি
নাত্থি কথন্ধাদিসা দুক্‌খা নাত্থি সন্তিপরংসুখং।
জিঘচ্ছা পরমারোগা সঙ্খার পরমাদুখা
এতং ঞ্ঞাত্বা যথাভূতং নির্বাণং পরমং সুখং।
আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুটি পরমং ধনং
বিস্‌সাম পরমাঞ্ঞাতী নির্বাণং পরমং সুখম্॥

রাগের সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় আর দ্বিতীয় পাপ নাই। শরীর ধারণের ন্যায় আর দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই, হিংসাই হইতেছে মানুষের পরম ব্যাধি, সংসার পরম দুঃখ, নির্বাণ পরম সুখ, যিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই পরম সত্যকে লাভ করিয়াছেন।

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্বাণই পরম সুখ।
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল
অসন্তোষ যত কিছু অসুখের মূল।
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস।
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্মই কল্যাণ মূর্তিমান,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান।*

এই বাণী সারনাথের বিদ্যায়তনে ধ্বনিত হইয়া ছাত্রীগণের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ বিধান করিত।

সারনাথ বৌদ্ধতীর্থ। এই স্থানেই বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মচক্র প্রথম প্রবর্তিত করেন। সারনাথ বুদ্ধদেবের জীবিতকাল হইতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এস্থানে দুই হাজার বৎসর পূর্বে বৌদ্ধদের অনেক দেবালয়, শ্রীমূর্তি, এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, কত বৌদ্ধবিদ্বেষী নরপতির অভ্যুদয় হইয়াছে। ফলে অসংখ্য বৃহৎ ও সুন্দর বিদ্যাভবন, মঠমন্দির, স্তূপ ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মহারাজ অশোক এই স্থানে যে একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। বর্তমান সময়ে মৃত্তিকা খননের সঙ্গে সঙ্গে সারনাথের নিকটবর্তী স্থান হইতে বিবিধ দেবমূর্তি, বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি বাহির হইয়া, প্রাচীন গৌরবস্মৃতি প্রকাশিত করিতেছে। কিছুকাল হইল সেখানে গবর্নমেণ্ট একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন কীর্তিসমূহ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

বিদুষী মালিনী দেবী সেই অতি প্রাচীনকালে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারদ্বারা মহিলাকুলের যে কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষিতা মহিলার অপূর্ব কীর্তিকাহিনী আমাদের নিকট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কিরণের ন্যায় আজিও শান্ত-স্নিগ্ধপ্রভাবিমণ্ডিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

* স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

শুক্লা

শিক্ষার নিমিত্ত যে দান, তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান আর পৃথিবীতে নাই। বৌদ্ধযুগে অনেক বিদুষী মহিলা নারীজাতির কল্যাণের জন্য বিদ্যা দান করিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। মালিনীর ন্যায় মহাপ্রাণা শুক্লাও শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

কপিলাবস্তু নগরে একজন মহাধনী বৈশ্য বণিকের গৃহে শুক্লা জন্মগ্রহণ করেন। শুক্লা পূর্ণচন্দ্রকরলেখার ন্যায় শুভ্রবর্ণা এবং অসামান্য দেহসৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্যও যেমন ছিল, আন্তরিক বিবিধ গুণেও তেমনি তিনি বিভূষিতা ছিলেন। ধনী পিতা কন্যাকে সর্ববিষয়েই সুপণ্ডিতা করিয়াছিলেন।

শুক্লার রূপ ও গুণের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নানাদেশ হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত যুবক ব্যতীত অনেক রাজা-মহারাজাও শুক্লার পাণি-গ্রহণাভিলাষী হইলেন। একদিকে যেমন শুক্লা রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, তেমনি তিনি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী কোটিপতি বিপুল ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন, কাজেই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য যে তরুণসমাজে একটা আকুল আগ্রহ জাগরিত হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শুক্লা বিবাহের পক্ষপাতিনী ছিলেন না। তাঁহার মর্মে বৌদ্ধধর্মের মহাবাণী গিয়া পৌঁছিয়াছিল। তিনি সাংসারিক শোকদুঃখপূর্ণ জীবন যাপন করা অপেক্ষা ত্যাগের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার মনে নির্বাণমুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শুক্লা বিবাহ না করিয়া কঠোর যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি অসামান্য সাধনাবলে "অর্হতী" উপাধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শুক্লা বিবাহ করিবেন না, এইকথা দেশবিদেশে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বহু রাজকুমার তাঁহার মন জয় করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। শুক্লা তাঁহাদিগকে সংসারের অনিত্যতা এবং নির্বাণমুক্তির গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, তাঁহারা সেই মহাতপস্বিনী নারীর নিকট আর বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা

তুলিতেই সাহসী হইলেন না। সকলেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিজ নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়া কুমারী শুক্লা মহিলাদের শিক্ষার ও থাকিবার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে এক সুবৃহৎ মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়া, তাঁহাদের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মহিলাদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন।

কাশীসুন্দরী

কাশী রাজার দুহিতা কাশীসুন্দরী সেকালে সুন্দরী ও ধর্মশীলা মহিলা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার পিতা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন; কাজেই তিনি কন্যাকে শৈশব হইতেই বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধদেবের পুণ্যজীবনকথা এবং বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্বসমূহ পড়িতে পড়িতে কাশীসুন্দরীর তরুণ যৌবনেই সংসারের প্রতি বীতরাগ জন্মিয়াছিল। সকল সময়েই তাঁহার মনে বুদ্ধদেব প্রবুদ্ধ হইবার সময় যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িত, কাশীসুন্দরী সর্বদা বলিতেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অন্নিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুণপ্পুণং।
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুণ গেহং নকাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা।

কত জাতি কত জন্ম ও জন্মান্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছি, তাঁহার সন্ধান পাই নাই। যিনি এই দেহরূপ গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, না জানি তিনি কোথায় আছেন। হে গৃহকারক দেবতা, পুনঃ পুনঃ দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করিয়া এইবার তোমার দেখা পাইয়াছি, তুমি আর গৃহকরণা করিতে পারিবে না। তোমার স্তম্ভ ভাঙিয়াছে, গৃহভিত্তিসমূহ চুরমার হইয়াছে, চিত্ত হইতে সংস্কার বিগত হইয়াছে—তৃষ্ণা বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই মহদ্বাণী তাঁহার প্রাণের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে আপনার জীবনকে সংসারের সর্বপ্রকার আসক্তিবিহীন করিবার জন্যই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অন্তরের এই কামনা বাহিরের কেহই জানিতে পারিলেন না।

এদিকে কাশীসুন্দরীর বিবাহের যোগ্য বয়স হইল। নানাদেশের রাজকুমারেরা তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য আসিতে লাগিলেন। রাজা কন্যাকে সে কথা বলিলেন। কাশীসুন্দরী বলিলেন তিনি চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়া যোগসাধনা ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। প্রত্যাখ্যাত রাজকুমারেরা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাদের মন হইতে রাজকুমারীকে লাভ করিবার আশা তিরোহিত হইল না।

কিছুকাল পরে ঋষিপত্তন বা বর্তমান সারনাথ নামক স্থানে ভগবান্ কাশ্যপ বাস করিতে আসিলে, কাশীসুন্দরী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভু! আমি আপনার নিকট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য আসিয়াছি।"

কাশ্যপ প্রথমে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু কাশীসুন্দরীর একান্ত আগ্রহ, চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং রাজকুমারীকে বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী ব্যর্থমনোরথ রাজকুমারেরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ভগবান্ কাশ্যপের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারেরা পণ করিয়া আসিলেন তাঁহারা বলপূর্বক রাজকুমারীকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবেন। তাঁহাদের এইরূপ সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া ভগবান্ কাশ্যপ কাশীসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তুমি যদি এই রাজকুমারদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি আমাকে অকপটে প্রকাশ করিয়া বল। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিব।"

কাশীসুন্দরী গর্বিত ভাবে উত্তর করিলেন—"দেব, আমি বিবাহ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই আপনার নিকট ধর্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আসিয়াছি। বিবাহ করিব না, ইহাই আমার পণ। এই রাজকুমারেরা অন্যায় ভাবে আমাকে পীড়ন করিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছেন।"

কাশ্যপ চিন্তিত হইয়া কহিলেন,—"বৎসে! এই রাজকুমারেরা তোমাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিবে। যদি তুমি আশ্রমে অবস্থান কর, তাহা হইলে আমার

আশ্রমেরও শান্তিভঙ্গ করিবে। অতএব তুমি এক্ষণে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতার নিকট গমন কর।"

তেজস্বিনী কাশীসুন্দরী কাশ্যপকে কহিলেন—"প্রভু! আপনার আশীর্বাদ-প্রভাবে এই সকল পাপিষ্ঠ রাজকুমারদের এমন ক্ষমতা নাই যে আমার কেশও স্পর্শ করিতে পারে। এই দেখুন আমি যোগপ্রভাবে শূন্যে আরোহণ করিতেছি।" এই বলিয়া যোগবলে কাশীসুন্দরী শূন্যে উঠিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি রাজকুমারদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন, আবার দেখা দিলেন। তাঁহার এইরূপ অপূর্ব যোগশক্তি দেখিতে পাইয়া রাজকুমারেরা আর কাশী-সুন্দরীকে লাভ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলেন না। তাঁহারা একে একে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মহামতি কাশ্যপও কাশীসুন্দরীর এইরূপ যোগশক্তি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই যোগশক্তি কিরূপে লাভ করিলে?"

কাশীসুন্দরী কহিলেন—"আমি আপনার নিকট শিক্ষা লাভার্থ আসিবার পূর্বে মহাত্মা কনকের নিকট হইতে যোগ-সাধন শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, সেই যোগ প্রভাবেই অদ্য আকাশে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম।"

কাশ্যপ বলিলেন,—"বৎসে, যোগশক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ এক শ্রেণীর নহে।"

রাজকুমারী বলিলেন,—"প্রভু, যোগশিক্ষা অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। আমি আপনার নিকট সে শিক্ষাই লাভ করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাকে সেই মহৎ শিক্ষাই প্রদান করুন।"

কাশ্যপ কাশীসুন্দরীকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া অসাধারণ জ্ঞানবতী করিলেন। বৌদ্ধযুগের নারীসমাজ কঠোর যোগ সাধনা করিতেও যে কোনরূপে ইতস্ততঃ করিতেন না, কাশীসুন্দরীর ন্যায় আরও অনেক মহিলার যোগশিক্ষার ইতিহাস হইতে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

সুমাগধা

—এক—

শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে বুদ্ধদেব প্রশান্ত ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার অপরূপ-রূপপ্রভায় সেই কাননভূমি আলোকিত। শিষ্যগণ তাঁহার মুখ হইতে সুমধুর উপদেশাবলী শুনিতেছেন,—এরূপ সময়ে অনাথপিণ্ডদ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণপদ্ম স্পর্শ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—"ভগবান্! আপনার কৃপায় সুমাগধা সর্বগুণে গুণবতী হইয়া সর্বত্রই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এক্ষণে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে শ্রীমান্ সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত তাহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমার ধনপ্রাণ সমুদয়ই প্রভুর হাতে। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারি।"

বুদ্ধদেব বলিলেন,—"বৎস, এইরূপ যোগ্যপাত্রে তুমি অনায়াসেই কন্যাদান করিতে পার।"

ভগবান্ তথাগতের অনুমতি লাভ করিয়া অনাথপিণ্ডদ প্রীতমনে পুণ্ড্রবর্ধনবাসী বৃষভদত্তের সহিত প্রচুর বিভব, বহু রত্ন, এবং উৎকৃষ্ট বসনভূষণ ইত্যাদি প্রদান পূর্বক কন্যার বিবাহ দিলেন। সুমাগধা অতি দূরতর দেশে যাইবার সময় অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নামোচ্চারণ করিতে করিতে গমন করিলেন।

—দুই—

দীর্ঘকাল পথ-পর্যটনের পর সুমাগধা শ্বশুরগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্বশুরশাশুড়ী তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কল্যাণী সুমাগধার পতিসেবা, কর্তব্য পালন ইত্যাদি দেখিয়া শ্বশুরগৃহের সকলেই তাঁহার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

একদিন সুমাগধার শ্বশ্রূ ধনবতী তাঁহাকে বলিলেন, "বৎসে! আমি সংসার-ত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমি তাহার আয়োজন এবং অন্যান্য পূজোপকরণ সমুদয় সজ্জিত কর। জগৎপূজ্য ভগবান্ জিন (জৈনধর্ম প্রবর্তক) আমার গৃহে আগমন করিবেন।"

সুমাগধা শ্বশ্রূর আদেশ অনুসারে সমুদয় পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়া পূজ্য অতিথিগণের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। জৈনভিক্ষুগণ ধনবতীর

ভোজ্যসম্ভারকার্যের ব্যয়ের কথা জানিতে পারিয়া পরদিন সদলবলে স্থমাগধার শ্বশুরভবনে আগমন করিলেন। জৈন ভিক্ষুগণ দিগম্বর, জটাজূটধারী, ভস্মবিভূতি মাখা এবং বিকটবদন। দম্ভবশতঃ ইহাদের বদন ভয়ঙ্কর এবং ক্রোধের ভাব মুখে ও চক্ষুতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত। এইরূপ আকৃতি ও প্রকৃতির সন্ন্যাসীরা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থমাগধার শ্বশ্রূ ধনবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসে! একবার আসিয়া দেখ, কেমন সব সন্ন্যাসীরা আসিয়াছেন।"

স্থমাগধা শাশুড়ীর আহ্বানে পরম আনন্দিত মনে কৌতূহলা হইয়া নিম্নে নামিয়া আসিয়া ঐ সব নির্লজ্জ, নগ্ন, মাংসভক্ষণাভ্যাসে স্থূলকায় মহিষের ন্যায় সন্ন্যাসীদিগকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বিমর্ষ ভাবে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে এইরূপ ভাবে ত্রস্তে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাছা, তোমাকে এইরূপ বিষণ্ণ ভাবে ফিরিতে দেখিতেছি কেন?" তখন স্থমাগধা বলিলেন, "আজ বহুকাল পরে আমি দেখিতে পাইলাম যে বধূগণ এইরূপ নির্লজ্জ সাধুসন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা যদি সাধু তবে অসাধু কে? এই সকল শৃঙ্গহীন পশুগণ আপনাদের গৃহে ভোজন করিতেছে, ইহারা মনুষ্য নহে; এজন্যই পুরমহিলাগণ ইহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিতা হইতেছেন না। ইহাদের মত দুর্জনের প্রতি যদি আপনাদের ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব যে, আপনারা অযোগ্য পাত্রে ভক্তি সমর্পণ করিয়াছেন। এ কিরূপ নিয়ম?—যে ব্যক্তি ভোজন ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে কিরূপে বস্ত্র ত্যাগ করিবে? এই সকল পশুরা যে দেশে পূজা পাইতেছে, সে দেশে পরিত্যাজ্য কি তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না।" স্থমাগধার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমার পিত্রালয়ে কিরূপ লোকের পূজা হইয়া থাকে বল।"

তখন স্থমাগধা ভক্তিগদগদচিত্তে প্রসন্ন মনে পরম উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আমার পিতৃগৃহে ভগবান্ জিনের (বুদ্ধের) পূজা হইয়া থাকে। ভগবান্ বুদ্ধদেব সমস্ত জগতের নরনারীর কুশল ও কল্যাণ চিন্তা করিয়া থাকেন।

"তাঁহার সৌম্যমূর্তি দেখিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সদানন্দময়। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। তাঁহার করতলে শঙ্খ, ধ্বজ, ও পদ্মমালার রেখা আছে। তিনি শান্তি ও সংযম সাম্রাজ্যের উপযুক্ত লক্ষণ বলিয়া ধারণ করেন। মহামুনিগণেরও অভিলাষজনক সেই মহাপুরুষের স্বভাব সর্বপ্রকার অভিলাষবর্জিত।"

স্থমাগধার শ্বশ্রূ পুত্রবধূর মুখে বুদ্ধদেবের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া স্থমাগধাকে

বলিলেন—"তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিতে পারা যায়? আমরা যদি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও কি পাপমুক্ত হইতে পারিব?" সুমাগধা বলিলেন—"নিশ্চয়ই পারিবেন।" শ্বশ্রূ কহিলেন,—"তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে যাহাতে দেখিতে পারি সে ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

সুমাগধা বলিলেন—"আমি আপনাদিগকে তাঁহাকে দেখাইয়া দিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সুমাগধা প্রাসাদের উপর আরোহণ করিলেন এবং সেখান হইতে ভগবান্ বুদ্ধদেব যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক পূজ্যপূজোপযুক্ত কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। সুমাগধা কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলে পর উহা সজীব ভক্তিদূতিকার ন্যায় সেই শ্বেত, রক্ত, হরিৎ ও অসিতবর্ণ ধূপগন্ধসুরভিত পুষ্পাবলী আকাশপথে ধীরে গমন করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যে জেতবনে উপস্থিত হইয়া ভগবানের পাদপদ্মের উপর নিপতিত হইল।

সর্বজ্ঞ ভগবান্—সুমাগধার সমস্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আনন্দকে বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে আমাদিগকে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে যাইতে হইবে। সুমাগধা আমার ও মদীয় সঙ্ঘগণের পূজা করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। পুণ্ড্রবর্ধন (গৌড়দেশ) এস্থান হইতে শতষষ্টি যোজনের অধিক। কিন্তু আমাদিগকে একদিনেই সেখানে যাইতে হইবে। আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না। যে সকল ভিক্ষুগণ প্রভাবশালী এবং শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই কেবল নিমন্ত্রণশলাকাপত্র* প্রদান কর।" আনন্দ সুগতের আদেশে প্রভাবশালী ভিক্ষুদিগকে শলাকাদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত ভিক্ষুগণ নানা প্রকার দিব্যবেশ ধারণ-পূর্বক বিমান দ্বারা আকাশমার্গে গমন করিলেন।

এদিকে সুমাগধার শ্বশুরগৃহেও সুগত ও ভিক্ষুগণের আদর অভ্যর্থনা করিবার বিরাট আয়োজন চলিয়াছিল। তাঁহার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও পতি সকলেই সুগতের দর্শনাভিলাষী হইয়া পুষ্প, ধূপ ইত্যাদি পূজোপকরণ সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দিব্যশক্তিসম্পন্ন ভিক্ষুগণ কেহ কনকপদ্মে আরোহণ করিয়া সৌরভ বিস্তার করিতে করিতে, কেহ মেঘের উপর আসীন হইয়া দিব্যপ্রভা বিস্তার করিতে করিতে

* প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে নিমন্ত্রণকালে কর্পূর, চন্দন, কস্তুরিকা প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য-দ্বারা নির্মিত একটি একটি শলাকা পত্র-সহ পাঠাইবার রীতি প্রচলিত ছিল।

আগমন করিতে লাগিলেন। সুমাগধার শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি এক একজন অদ্ভুতকর্মা ভিক্ষুকেই ভগবান্ সুগত বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

সহসা জগৎ যেন কাঞ্চনবর্ণসন্নিভ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—শত সূর্য প্রকাশজনিত আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইল এবং অশেষ সন্তাপের প্রশমন হওয়ায় শীতাংশুশতমালা দ্বারা যেন জগৎ শীতল হইয়া গেল। ভগবান্ তথাগতের পবিত্রমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল।

ভগবান্ তথাগত সুমাগধার গৃহে প্রবেশ করিলে মনে হইল যেন উহা শতশশিকান্তমণির প্রভায় প্রভাম্বিত হইয়াছে। এখন সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিলেন। পুরবাসিজন বহির্দেশে ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত ভগবানের ছায়ামাত্র অর্চনা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ সুগত সুমাগধার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সঙ্ঘ সহ পূজা গ্রহণ করিলেন এবং সকলের প্রতি প্রসন্ন-দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসাদ বিধান করিলেন। সুমাগধার শ্বশুর, স্বামী প্রভৃতি প্রিয়জন এবং অন্যান্য সমস্ত পুরবাসিগণ সুগতের সুমধুর উপদেশ লাভ করিয়া বিশুদ্ধাশয় হইয়া তৎক্ষণাৎ সত্যদর্শন করিলেন।

শিক্ষিতা ও পুণ্যবতী পুত্রবধূ সুমাগধার দ্বাবা এই ভাবে তাঁহার শ্বশুরাদিবর্গ পুণ্যধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এখানে আমরা একটা বিষয়ের আলোচনা করিব। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের স্বহস্তনির্মিত চীরপুঞ্জ এমন সুন্দর সুবিন্যস্ত ভাবে পরিহিত হইত যে, তাঁহারা আহার বিহার বাস বসনে অন্যান্য সন্ন্যাসিসম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দিগম্বরদের ন্যায় বিবস্ত্র থাকিতেন না। ত্রিবসনমণ্ডিত সুরুচিসঙ্গত ভদ্রসাজে সজ্জিত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতেন। ইহার মূলের ইতিহাস এই যে—বুদ্ধদেব প্রথম অবস্থায় উরুবেলার বনে নিঃশ্বাসরোধ, দীর্ঘ উপবাস এবং শরীর শোষণকারী অশেষ প্রকার কঠোর তপস্যা করিতে করিতে এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলেন যে, একদিন পথে চলিতে চলিতে মূর্ছা গিয়া ভূমিতলে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্ছাভঙ্গ হইবার পর তিনি স্থির করিলেন যে, কঠোর সাধনা নিষ্ফল, কাজেই তাহা হইতে বিরত হইলেন এবং অনশনব্রত পরিত্যাগপূর্বক আহারাদির দ্বারা শরীরে বলপ্রাপ্ত হইয়া ধর্মসাধনের অন্য পথ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গৌতম বুদ্ধত্বলাভের পর মধ্যপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উপবাস বা শরীরশোষণ প্রকৃত ধর্মসাধন নহে, আত্মসংযম ও সত্যানুশীলনই

আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ; শরীরে বল না থাকিলে আত্মারই বলহানি হয়, বুদ্ধদেব তাহা পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এজন্যই শারীরিক কষ্ট কল্পনা ছাড়িয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টি করা—ধ্যান ধারণা আত্মসংযম দ্বারা মনোবৃত্তিসমুদয়েব সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলাই একান্ত কর্তব্য। বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিত বলিয়াই তাঁহাদের চালচলন, রীতিনীতি, সাজসজ্জা সম্পূর্ণভাবে অন্যান্য সন্ন্যাসিসম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র প্রকারেব ছিল।

রুক্মাবতী

সেকালে উৎপলবতী নগরীতে রক্মাবতী নামে এক বিদুষী, ধনশালিনী ও দয়াবতী মহিলা ছিলেন। ইঁহার দান, ধ্যান ও জনপ্রীতির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একবার দেশমধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কেবল দুর্ভিক্ষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃষ্টি, মহামারীও আরম্ভ হইয়া গেল। দেশে খাদ্যদ্রব্যের এমন অপ্রাচুর্য হইল যে, লোক বনের ঘাস পাতা ইত্যাদি খাইয়া অতি কষ্টে জীবন ধাবণ কবিতে আবম্ভ করিল। ক্রমে তাহাও হ্রাস পাইল। তখন লোকে অনাহারে মরিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শত শত নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সুন্দর জনপূর্ণ বৃহৎ নগরী শ্মশানে পরিণত হইল।

মানুষ খাদ্যাভাবে স্নেহ, মায়া, মমতা সকলই বিসর্জন দিয়া থাকে। একদিন রুক্মাবতী রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন যে, একটি ক্ষুধার্ত কঙ্কালসারা রমণী খাদ্যাভাবে স্নেহ, মায়ামমতা ভুলিয়া, আপনার সদ্যোজাত শিশুর সজীব দেহ ভোজন করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া রুক্মাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। মানুষ যে এমন পিশাচ হইতে পারে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি সেই ক্ষুধার্তা নারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তুমি এ কি করিতেছ?—এইভাবে আপন সন্তানের প্রাণনাশ করিও না। তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমার জন্য আমার গৃহ হইতে

খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিতেছি।" তখন সেই ক্ষুধার্তা রমণী কহিল—"কি খাই বল? দেশে তৃণগাছটি পর্যন্ত নাই, কি খাইয়া জীবনধারণ করিব?" রুক্মাবতী বলিলেন—"একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই খাদ্যদ্রব্য লইয়া তোমার নিকট আসিতেছি।"

এইকথা বলিয়াই, তাঁহার মনে হইল যে, যদি এই নারীর নিকট তাহার শিশুকে রাখিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে এই নারী যেরূপ ক্ষুধার্তা হইয়াছে, তাহাতে সে কখনও সদ্যপ্রসূত সন্তানটির জীবন রক্ষা করিবে না। শিশুটিকে নিশ্চয়ই খাইয়া ফেলিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আপনার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা শানিত ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা আপনার স্থূলমাংসল স্তনদ্বয় কাটিয়া ঐ ক্ষুধার্ত রক্তমাংসলোলুপা নারীর নিকট অর্পণ করিয়া শিশুটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত দানের কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে দলে দলে নরনারী আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল। সকলের মুখে তাঁহার প্রশংসা। আত্মপ্রশংসা শোনার ন্যায় আর দ্বিতীয় পাপ নাই, এইরূপ মনে করিয়া রুক্মাবতী নগর পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যমধ্যে একটি আশ্রম নির্মাণ পূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিদুষী মহিলার পদপ্রান্তে বসিয়া বহু তপস্বিনী নারী বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পালি-সাহিত্যে তাঁহার এই অসীম বদান্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

অম্বপালী

সেকালের অনেক বিদুষী পতিতা রমণীও মহাপ্রাণ বুদ্ধদেবের কৃপালাভ করিয়া পবিত্র ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। সেই সকল নারীদের মধ্যে অম্বপালীর নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অম্বপালীর প্রকৃত নাম কি তাহা জানা যায় না। তবে এই রূপসী পতিতা রমণীর একটি সুবৃহৎ আম্রকানন ছিল বলিয়া তিনি অম্বপালী নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত বৈশালীনগরের অনতিদূরে কোঠিগ্রাম নামক পল্লীতে তাঁহার সুবৃহৎ প্রাসাদ, উপবন এবং আম্রকাননাদি ছিল।

ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার মহাপরিনির্বাণের চারিপাঁচ মাস পূর্বে বর্ষার প্রাক্‌কালে

একদিন শিষ্যগণ সহ অম্বপালীর আম্রকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেব বিশ্রামলাভের পর শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে অম্বপালী তাঁহার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। অম্বপালীর সহজ শোভন সুন্দর বেশভূষা ও মোহিনী মূর্তি দেখিয়া বুদ্ধদেবও ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—"এই স্ত্রীলোকটি কি পরমাসুন্দরী! রাজপুরুষেরাও ইহার রূপলাবণ্যে মোহিত ও বশীকৃত। অথচ এ কেমন সুধীর শান্ত, সাধারণ স্ত্রীলোকেব ন্যায় যৌবনমদমত্তা চপলস্বভাবা নহে। জগতে এইরূপ রমণী সুদুর্লভ।"

অম্বপালী বুদ্ধদেবের সৌম্যশান্ত সুগম্ভীর মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া বুদ্ধদেবেব পার্শ্বে বসিলেন। বুদ্ধদেব তখন উপদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার বদন হইতে অমৃতেব বাণী নিঃসৃত হইতেছিল। সেই ধর্ম-উপদেশ শুনিয়া পতিতানারী মুগ্ধা হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিয়া বাসনার মূলোচ্ছেদ করিলেন। অম্বপালীর চিত্ত দ্রব হইয়া সত্যধর্মের প্রতি তাঁহার মন ধাবিত হইল। অম্বপালী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পূর্বে ভক্তিভাবে বুদ্ধদেবের শরণপ্রার্থী হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"প্রভু! কল্য আপনার শিষ্যমণ্ডলী সহ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।" বুদ্ধদেব বিনা দ্বিধায় এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ একজন পতিতা রমণীর গৃহে ভোজন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এই সংবাদে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বৈশালীর লিচ্ছবি বংশীয় রাজা তাঁহার রাজধানীর অনতিদূরে বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া স্বয়ং বহুসংখ্যক নাগরিকের সহিত যানাদি সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ পূর্বক রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজার সঙ্গিগণ অপূর্ব সাজসজ্জা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ শুভ্র, কেহ বা রঙিন বেশে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। বুদ্ধদেব ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন, "দেখ, ইহাদের কেমন সাজসজ্জা, ঠিক যেন দেবতারা ভূতলের ক্রীড়াকাননে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ আসিয়া বুদ্ধদেবকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে তিনি কহিলেন—"আমি অম্বপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।" তখন বৈশালীর নৃপতির সঙ্গিগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া অম্বপালীর নিকট যাইয়া বলিলেন,—"তুমি নিমন্ত্রণবাক্য প্রত্যাহার কর। বুদ্ধদেবকে রাজভবনে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। যদি তুমি

রাজার এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে তোমাকে তিনি তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিবেন।" অম্বপালী পতিতা নারী। বৈশালীর একজন সামান্যা প্রজা। তবু সে বিচলিতা না হইয়া দৃঢ়তার সহিত কহিল, "তোমরা যদি রাজকোষের সমস্ত অর্থ, সমস্ত বৈশালীনগর—উপনগর সমস্তই আমাকে দান কর, তাহা হইলেও আমি ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিব না।" লিচ্ছবিগণ অম্বপালীকে নানারূপে গ্লানি করিতে করিতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে বুদ্ধদেব সশিষ্য অম্বপালীর ভবনে গমন করিলে, অম্বপালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা তাঁহার পরিতোষ সাধন করিলেন। আহারান্তে অম্বপালী ভগবান্ বুদ্ধদেবকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আমার উদ্যান, এই গৃহ ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্ঘে সমর্পণ করিতেছি। আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" বুদ্ধদেব এই পতিতা রমণীর প্রদত্ত প্রীতি-উপহার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বহুতর ধর্মোপদেশ-দানে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অম্বপালী এইভাবে যৌবনেই সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই কার্তিকের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভগবান সুগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরেও যুবতী অম্বপালী বহুদিন জীবিতা ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে অম্বপালী একটি অতি সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন। এই গানের রচনা হইতে বুঝিতে পারা যে প্রাচীনযুগে একজন পতিতা নারী কতদূর সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিতেন যে মানবজীবনে জরা একদিন আসিবেই। যেদিন সত্য সত্যই জরা আসিয়া অম্বপালীর সুন্দর দেহের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিল তখন সেই জরাকে অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ রূপগৌরবের কথা অম্বপালী তাঁহার বিরচিত গাথায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার রচিত সেই গাথাটির অনুবাদ প্রদান করিলাম :

ভ্রমরের মত কাল ছিল কেশ বর্ণে,
কুঞ্চিত ছিল বেণী-পর্ণে ;
আজি যে জরায় মাথা শণের মতন সাদা ;
প্রভুর বচন জাগে মর্মে।

সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?
স্থগন্ধি চূর্ণকে ছিল কেশ স্থরভি,
গুঁজিতাম সদা তায় চম্পক করবী।
শশকের লোমপ্রায়, গন্ধ এখন তায় ;
যাবে সব ; সারহীন গরবই—

* * *

নীল রঙ্গে তুলি দিয়া যেন পটে লিখিত
ভ্রূযুগল স্থন্দর ললিত।
জরায় এখন তথা, পেশীগুলি অবনতা ;
স্থন্দরী আমি আজ নহি ত।
মণিসম স্থরুচির ভাস্কর আলোকে।
স্থনীল আয়ত আঁখি, পলকে
করিল মলিন যে হে ! জরা প্রবেশিয়া দেহে !
আকরিবে হেন ধন বল কে ?

* * *

উপবনে কোকিলার মত আমি নিতি গো
গাহিতাম স্থস্বরে গীতি গো।
গেছে সে মধুর স্বর। তবু কেন করে নর
এ দেহের 'পরে এত প্রীতি গো ?

* * *

এমনি ত জর্জর—দেহদুখগেহটি
তার পানে ফিরে চাহে কেহ কি ?
দেয়াল হইতে ঝ'রে রূপের প্রলেপ পড়ে !
গরবের ধন এই দেহ কি ?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?*

* বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "থেরীগাথা" হইতে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

পটাচারা

মানুষ অনেক সময় শোকের ভিতর দিয়াই ধর্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। পটাচাবার জীবন হইতে একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পটাচারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে কি নামে পরিচিতা ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহার জীবনের ইতিহাস বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী।

শ্রাবন্তী নগরের একজন ধনবান্ বণিকের গৃহে ইহার জন্ম হয়। যৌবনে পটাচারার সহিত এক ধনী বণিক্-কুমারের বিবাহ দিবার জন্য পিতামাতা বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু পটাচারা প্রতিবেশী এক তরুণ যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সেই দরিদ্র যুবককে বিবাহ করেন এবং বহু দূরদেশে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

প্রথমে এই তরুণ দম্পতীর জীবন সুখেশান্তিতে একরূপ চলিতেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে নানা দুঃখদৈন্যের আক্রমণে পটাচারার জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। দূর প্রবাসে বাস করিবার কয়েক বৎসর পরে পটাচারার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। বহুদিন পিতা মাতার নিকট হইতে দূরে থাকায় তাঁহার নিকট দূর প্রবাস অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন পটাচারা স্বামীকে দেশে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পটাচারা তৎসময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বামী সেই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রসবসময়ে তাঁহার স্বামী বনমধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যাইয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন পটাচারা নানারূপে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সহায়হীনা অবস্থায় সন্তান দু'টির সহিত দূরদেশে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। দুর্ভাগিনী পটাচারা পুত্র দু'টিকে লইয়া সেই নিবিড় নির্জন দেশ হইতে পিতৃগৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। পথে পুত্র দুইটির মৃত্যু হইল। পতি-পুত্রশোকে পটাচারা একেবারে পাগলিনীর মত হইলেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল শ্রাবন্তী নগরীর অনতিদূরে। শ্রাবন্তী নগরে আসিয়া শুনিলেন যে, কিছুদিন হইল তাঁহার পিতামাতা এবং ভ্রাতা একই দিনে ভীষণ ঝড়বৃষ্টির সময়ে ঘরচাপা পড়িয়া একসঙ্গে প্রাণ হারাইয়াছেন। তখন পটাচারার হৃদয় একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। তিনি একেবারে উন্মাদিনী হইলেন, পথে পথে কাঁদিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিলেন—

দুইপুত্র পতিসনে পরলোকে করিল গমন,
মাতা-পিতা-ভ্রাতা—সবে মরণেরে করিল বরণ !
অভাগিনী পটাচারা কেঁদে কেঁদে পথে পথে চলে !
কে তার মুছায় অশ্রু, সান্ত্বনার দু'টি কথা বলে ?

এসময়ে ভগবান বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মধুর কথা চারিদিকে সু-প্রচারিত। এই শোকদুঃখপ্রপীড়িতা দীনা নারী কাঁদিতে কাঁদিতে বুদ্ধদেবের চরণে যাইয়া নিপতিত হইলেন।

বুদ্ধদেব মধুর সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা এই শোকদুঃখকাতরা নারীকে শান্ত ও সংযত করিলেন। সে সৌম্য শান্ত মহাপুরুষের মহদ্বাণীতে পটাচারা শোক ভুলিলেন—সংসার ভুলিলেন। তিনি ভিক্ষুণী হইলেন। পটাচারা ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিবার পর শত শত শোকদুঃখকাতরা নারীকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁহারা পটাচারার মধুর বাক্যে শোকদুঃখ ভুলিয়া গিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন! পটাচারার ধর্মোপদেশে মোহিত হইয়া একবার এক সঙ্গে পাঁচশত মহিলা বুদ্ধদেবের ধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন।

পটাচারার উপদেশ বহু নরনারীর চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিত। তাঁহার শিষ্যগণ তদীয় মধুর উপদেশসমূহ গান করিয়া বেড়াইতেন। এখানে আমরা তাঁহার একটি উপদেশের অনুবাদ প্রদান করিলাম :

কোন্ পথে এসে জীব, কোথা যায়, জান না যখন,
"গেছে চলি পুত্র"—বলি কেন তবে কর গো রোদন ?
এই ত জীবের ধর্ম, আসে যায় তাহা কি জান না ?
তবে কেন কাঁদ তুমি ? কেন কর এ অনুশোচনা ?
অযাচিত এসেছিল, অজ্ঞাত পথেতে গেছে চলি।
কোথা হতে এসেছিল, কটা দিন রবে হেথা বলি ?
উদিয়া মনুষ্যরূপে অন্য পথে অন্য জন্ম পায় ;
এই যাতায়াত বার্তা ! বিয়োগের দুঃখ কি ধরায় ?"*

* বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ।

সংঘমিত্রা

মহানুভব মহারাজ অশোকের নাম জগৎপ্রসিদ্ধ। অশোক রাজা হইবার আট বৎসর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গরাজ অশোকের নিকট পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে কলিঙ্গ দেশের এক লক্ষেরও বেশি লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। দেড় লক্ষ লোক বন্দী হইয়াছিল; যুদ্ধের পর ঐ দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দিল, তাহাতেও বহু সহস্র লোক প্রাণ হারাইল। কলিঙ্গদেশ একেবারে শ্মশান হইয়া গেল।

এই যুদ্ধে অশোকের মনের আশ্চর্য পরিবর্তন হইল। দেশ জয় করিতে হইলে এত মানুষ মারিতে হয়, এত লোকের সর্বনাশ করিতে হয়, রাজ্যলোভের জন্য পৃথিবীতে এত অশান্তির আগুন জ্বালাইতে হয়—এই মহাসত্য অশোক মনেপ্রাণে অনুভব করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবনে আর কখনও যুদ্ধ করিব না।" অশোক তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে উপগুপ্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্মের বিবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করিবার পর তিনি রাজধানীতে এক বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করিলেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পরামর্শ মত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা স্থানে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিলেন। এবার অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে তাঁহার প্রেরিত অনুচরগণ ধর্মের বিজয়-বার্তা বহন করিয়া পৃথিবী জয়ে বাহির হইলেন। এমন কি সমদর্শী অশোক তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে পর্যন্ত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সংঘমিত্রার জন্মের একটু ইতিহাস আছে। পিতা বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক উজ্জয়িনীর শাসনকর্তারূপে তথায় বাস করিতেন। সে সময়ে পিতার অজ্ঞাতে তিনি তথাকার এক সুন্দরী শ্রেষ্ঠিকন্যাকে বিবাহ করেন। একথা বিন্দুসার পাটলিপুত্রে থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই পত্নীর গর্ভে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর অশোক যখন সম্রাট হইলেন তখন এই পুত্র এবং কন্যা কিছুদিন পরে পত্নীর সহিত পাটলিপুত্রে আগমন করেন।

অশোক পুত্র ও কন্যাকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিবিধ নীতিকথা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিলেন। সংঘমিত্রা সমস্ত বৌদ্ধগাথা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সংঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা হইয়াও তাঁহার কোন গর্ব ছিল না, বিলাস ছিল না। কি বসনভূষণে, কি সাজসজ্জায়—সর্ব বিষয়েই ছিল তাঁহার ত্যাগ ও সংযম। রাজকুমারী হইয়াও সংঘমিত্রা ভিক্ষুণীদের সহিত মিশিতেন। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা, উভয়েই সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

সংঘমিত্রা এইরূপ ভাবে ধর্মালোচনা করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে ধর্মানুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া চৌরাশি হাজার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। যেদিন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সংকল্পিত চৌরাশি হাজার বিহারের নির্মাণকার্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সেদিন তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে মহাদানোৎসব সম্পন্ন হইবে।

রাজা দানসভার বিরাট আয়োজন করিলেন। দানযজ্ঞ মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায় সম্রাটের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। সম্রাট অশোক জ্ঞানবৃদ্ধ মহাতাপস ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন দেখি, কিরূপ দান করিলে আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীলরূপে পরিচিত হইতে পারিব?"

ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিষ্য বলিলেন, "যিনি পুত্র বা কন্যাকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করিতে পারেন বা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বৌদ্ধধর্মের প্রধান ও প্রকৃত পোষক।"

সেই সভাস্থলে সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট মহাস্থবিরকে বলিলেন, "তাহাই হউক। আমি আমার পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্মের জন্য উৎসর্গ করিলাম।" তখন সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"॥

সকলে মহারাজ অশোকের এই অপূর্ব দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া শত শত সাধুবাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের নাম উপসম্পদা। সংঘমিত্রা এই উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। সংঘমিত্রা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মঠে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধর্মোপদেশ এবং মহৎ আদর্শে বহু ধনী ব্যক্তির কন্যাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাস্থবির তিষ্যের আদেশে সংঘমিত্রা ভ্রাতা মহেন্দ্রের সহিত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহল গমন করিলেন।

সিংহলের নৃপতি যখন জানিতে পারিলেন যে, মহারাজ অশোক তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের আগমনবার্তা সিংহলে সর্বত্র প্রচারিত হইলে সিংহলের নরনারীগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের উপদেশ শুনিবার জন্য রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সংঘমিত্রার সুমধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সিংহলের মহিলাগণ দলে দলে আসিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে সিংহলের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল। সিংহলরাজ্যের সর্বত্র ধর্মের স্রোত প্রবাহিত হইল। সিংহল-রাজকুমারী অনুলা এবং তাঁহার পাঁচশত সহচরী সংঘমিত্রার আদর্শে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিলেন এবং রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্বক মহামেঘ নামক উদ্যানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনুলার আদর্শে সিংহলের সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলারাও দলে দলে আসিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হইলেন। এইভাবে সংঘমিত্রার চেষ্টা-যত্নে এবং অনুলার সহায়তায় সিংহলে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠিত হইল। এইভাবে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সিংহলের অধিপতিও বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিলেন। সিংহল-নৃপতি অশোকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাজ্যমধ্যে ধর্মনীতি ও সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

একদিন সিংহল-নৃপতি ও তাঁহার কন্যা সংঘমিত্রাকে বলিলেন, "দেবি! যে বোধিবৃক্ষের শান্তশীতল ছায়াতলে বসিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং নির্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, আপনি যদি সেই পবিত্র বৃক্ষের একটি শাখা সিংহলে আনিয়া রোপণ করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এদেশের পরম কল্যাণ সাধিত হয়।" সংঘমিত্রা ভারতবর্ষ হইতে বোধিবৃক্ষের একটি শাখা সিংহলে আনয়ন করিলে পর, উহা মহাউৎসবের সহিত সিংহলে রোপিত হইয়াছিল।

এক সময়ে ভারত মহিলারা 'কেবল যে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার আদর্শকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বত্রও যাহাতে তাঁহাদের সেই আদর্শ অনুসৃত হয়, সেজন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সংঘমিত্রার আদর্শ ও ত্যাগের তুলনা জগতের ইতিহাসেও নাই বলিলেই চলে।

রাজা অশোক যখন পুত্র ও কন্যাকে সিংহলে প্রেরণ করেন, তখন দেবানাং প্রিয় তিষ্য সিংহলের নৃপতি ছিলেন। তিষ্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভের পর অনুরাধা-পুরের অনতিদূরে মহিন্তালী পর্বতের শিখরদেশে একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই নির্জন সুন্দর পর্বতাশ্রমে মহেন্দ্র কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

দেবানাং প্রিয় তিষ্য বিংশতি বর্ষ কাল রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহলে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র ধর্মের যে বীজ সেখানে বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দিন দিন প্রসার লাভ করিতে থাকে। কয়েক শতাব্দী পরে সিংহল হইতেই বৌদ্ধধর্ম সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ও তাহাব নিকটবর্তী নানা স্থানে বিস্তারলাভ করে।

একজন রাজকুমারীর পক্ষে ধর্মের জন্য ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ, ধর্মনীতি ও ধর্মশিক্ষাব ভিতর দিয়া জীবন যাপন এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ধর্মপ্রচার করা একমাত্র ভারত মহিলার পক্ষেই সম্ভবপর। সংঘমিত্রার নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তাঁহার নাম কেহ কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।